উপস্থাপিত করিতে পারেন কি না, আরো সন্দেহের বিষয়। দায়ীত্ব সম্পূর্ণ এবং কেবল যদি তাঁহারই হয়, তবে ব্যবস্থাপক-সভার নিকট একই ব্যয়-প্রশ্ন বা দাবী বারম্বার কোন অছিলায় উথাপিত হইতে পারে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত। এই প্রসঙ্গে, একটা প্রশ্ন হইয়াছে যে মূল দাবী হইতে মোটামুটী ভাবে "থান্‌কো" (lump) কোন হ্রাস করিবার ক্ষমতা, বে-সরকারী সদস্যদের নাই। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না, বিধানটি হইতেছে—
The Council may assent, or refuse its assent, to a demand, or may *reduce* the amount therein referred to either by a *reduction of whole grant* or by the omission or *reduction of any items* of expenditure of which the grant is composed। উদ্ধৃত অংশের "reduction of the whole grant অর্থে নিশ্চয় "থানকো" হ্রাসই সূচিত হয়, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বা নামঞ্জুর (refusal) নহে। যাক, ইংরাজীতে যেমন বলে পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিয়াছে, আমাদের দেশে, পুনর্মূষিক ভবঃ। আমলা-তন্ত্র যে ২২,৯৭,৭০০্ টাকা চাহিয়াছিলেন, একটী কাণা কড়িও তাহা হইতে কমে নাই, সমস্তটাই পুনর্বিবেচনায় মঞ্জুর হইয়াছে। আশা করি, সকলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থ অনুধাবন করিয়াছেন, আশা করি, সকলে মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের সুবিবেচনায় পুলীশ বিভাগের দাবী প্রকৃত এবং এক কপর্দ্দকও হ্রাস করিলে তাহা চলিতে পারে না। যে দায়ীত্ব ছিল লাট সাহেবের, আশা করি তাহা স্বয়ং বরণ করিয়া লইয়া বে-সরকারী সদস্যগণ তৃপ্ত আছেন। একেই বলে স্বায়ত্ত-শাসন। সকল সদস্য বলা ভুল হইয়াছে। দেশ একবার আটাশ বীরের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন, আজ আমরা বলি—'সাবাস সাতাশ'। সপ্তবিংশতি সদস্য যে নির্ভিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাদের শত শ্লাঘা করিতেছি। আর সকলকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি, বাইবেলের 'প্রবাদ'-গ্রন্থের, ২৬শ অধ্যায়ে, একাদশ শ্লোকে উক্ত আছে—

As a dog returneth to his vomit, *so* a fool returneth to his folly.
— 26 Prov.,ii.

* * *

সম্রাট খুল্লতাতের ভারত ভ্রমণের ব্যয়। মহামহিমান্বিত ডিউক অব কনটের ভারতভ্রমণ সূত্রে প্রকাশ, ভারতকোষ হইতে মোট ব্যয় হইয়াছে, মোট ৪৫,১২,৭৯৪ টাকা। অলমতি বিস্তরেণ।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। স্বনাম-প্রসিদ্ধ, 'ভূপ্রদক্ষিণ'-প্রণেতা, নব্যভারতের পুরাতন লেখক ৺চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় 'কর্ম্মপ্রসঙ্গ বা মানব-জীবন-রহস্য-শীর্ষক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশিত করিবার অব্যবহিত পরেই ইহলীলা সম্বরণ করেন। গ্রন্থখানি 'জন্মমরণ সঙ্কুল সংসারপথের অবসন্ন পান্থগণকে, উৎসর্গীকৃত'। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। শুনিলাম, গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য, সেন মহাশয়কে ঋণ-গ্রস্থ অবস্থায়ই পরপারের যাত্রী হইতে হইয়াছিল। গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। এই গ্রন্থ সকল ঘরে স্থানলাভ করিলে,—রথ দেখা, কলা বেচা,—সুখপাঠ্য গবেষণাপূর্ণ সন্দর্ভ পাঠ এবং পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, দুই-ই হইবে। আর, মধ্য হইতে, তদীয় পুত্র শ্রীমান নিমাইচন্দ্র সেন (৪৪ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা) পিতৃ-ঋণ শোধ করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

* * *

২। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত। তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। ছাপা, কাগজ বেশ ভাল।

আমরা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত একাধিকবার পাঠ করিয়াছি। ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবন-চরিত ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই অতীব আদরের জিনিষ। ধর্ম্মের জন্য তাঁহার প্রাণের কি গভীর আকাঙ্ক্ষা, কি কঠোর আত্ম-সংযম ও আত্ম-নিগ্রহ, কি স্বার্থত্যাগ, কতই ব্রত-গ্রহণ আর পালন, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। "আশৈশব সকল কার্য্যেই তিনি ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে ভাল বাসিতেন।" এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তিনি এরূপ উন্নত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থখানির ভাষা বেশ সরল ও হৃদয়-গ্রাহিনী। আর শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনের ইতিহাস এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনাবলীতে পূর্ণ যে, গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় মনে হয় যেন একখানি গল্পের পুস্তক পড়িতেছি। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থপাঠে নিঃসন্দেহ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকর্ত্রী এই অমূল্য জীবন-কাহিনী সম্পাদিত করিয়া দেশের লোকের মহদুপকার সাধন করিলেন।

৩। 'হিন্দু মুসলমান'। নিউ এরা পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও ভাব ও উদ্দেশ্য অতি মহৎ। হিন্দু-মুসলমানে কিরূপ একতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজগত স্থূল পার্থক্যের অন্তরালে বস্তুতঃ যে কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রভেদ নাই, পুস্তকখানি পাঠে তাহা জানা যায়। ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে এই মতের স্বপক্ষে নানা উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সময়োপযোগী পুস্তক, ছাপাও বাঁধান চমৎকার, উপহার দিবার যোগ্য। পুস্তকের আদর বাড়া উচিত।

৪। শ্রাদ্ধতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত, অখিল ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মণ সমাজ-রক্ষা মহা-সভার পক্ষে প্রকাশিত; মূল্য তিন আনা। পুস্তকখানিতে, শ্রাদ্ধ কি, কি ভাবে কোন সময় হইতে এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজে শ্রাদ্ধ-প্রথার প্রবর্ত্তন ও সম্প্রসারণ হইয়াছে, অন্যান্য দেশবাসীগণ মধ্যে শ্রাদ্ধের ভাব ও অনুকল্প বিস্তার কি ভাবে কতকাল হইতে সংঘটিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কতদূর নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ রহিয়াছে, বেদ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে কত প্রকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রভৃতি নানা জটিল প্রশ্নের সমাধা গবেষণার সহিত করা হইয়াছে। পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। ছাপা কাগজ আরো কিছু ভাল হইলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত হইত। বোধ হয়, বহুতর প্রচার হয়, এই আশায় মূল্য কম রাখিতে গিয়া, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকখানি সকল হিন্দুঘরে প্রচার হওয়া উচিত।

৫। যুগাবতার মহাত্মাগান্ধী ও স্বরাজ্য। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ময়মনসিংহ মডেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য, মূল্য দুই আনা। ডিমাই, ৮ম, ২৪ পৃষ্ঠা। পুস্তকখানি পাঠে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত আদর্শের মর্ম্মার্থ জানা যায়। সরস, তরল ভাষায় তাঁহার মত, আদর্শ এবং তাহা জীবন-গত করিবার অনুষ্ঠিত উপায়গুলির এপ্রকার যুক্তিযুক্তপূর্ণ সমর্থন অনেক নাই। এই সময়ে, এ শ্রেণীর প্রবন্ধের সমাদর হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

৬। কুল সঙ্গীত। স্বর্গীয় কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ সঙ্কলিত, ত্রয়োদশটী ভক্তের ভক্তি-বিহ্বল পারমার্থিক সঙ্গীত সম্বলিত, উপাদেয় পুস্তক। রচয়িতা 'নব্যভারতের' সুপরিচিত শ্রীদরবেশের পিতৃদেব; ভূমিকায় এই তান্ত্রিক সাধকের একটী মনোরম জীবনালেখ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি ছাপা ও কাগজ ভাল, মূল্য দুই আনা মাত্র। ভক্ত মাত্রেই এই পুস্তিকাখানি পাঠে তৃপ্ত হইতে পারিবেন, আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাত্মা গান্ধীর মতের দার্শনিক অ[illegible]

গত শতাব্দীর ৬০ হইতে ৮০ সাল অবধি, ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজের অনুকরণ করিতেই ভাল বাসিতেন। ইংরাজীতে কথা, ইংরাজের চাল চলন, হাসি কাসির অনুকরণ, শিক্ষিত ব্যক্তি গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। তখন মিল স্পেনসারের ছাঁচে দেশীয় সমাজ গঠিত হইতেছিল। তাঁহাদের মতের প্রভাব ইউরোপেও যথেষ্ট ছিল। তাহা ছাড়া জীবের ক্রমাভিব্যক্তি এবং ইতর জীব হইতে মানবের উৎপত্তি প্রভৃতি মত তখন ইউরোপকে তোলপাড় করিতেছিল। মানব-জ্ঞান কোন জাতিবই নিজস্ব নহে, ইহা সার্ব্বজনীন, সকল জাতিরই ইহাতে সমান অধিকার। কোনও নূতন মত মনের মত হইলে, ঠিক যেন ঔষধের মত ধরে এবং আমাদের দেশের উহার সেই দশা হইল।

ইউরোপের কথায় আমাদের কাজ নাই। আমাদের দেশের সম্বন্ধে দু'কথা বলাই প্রয়োজন। পাশ্চাত্য লেখকদের কথাই তখন আপ্ত-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীতির সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, আমরাও তাহাই বুঝিলাম। মিল বলিলেন, দারিদ্র্যই মহাপাপ এবং মানুষ মাত্রেই সমান, আমরাও কথাটা ঐ ভাবেই বুঝিলাম। দেশের কথা, শাস্ত্রের কথা, তখন লোকে বিষ মনে করিত। কেহ খ্রীষ্টান হয়, কেহ নূতন-গড়া সমাজে যায়, কেহ তর্ক করে, কেহ কুসংস্কার ছাড়িতে বলে। প্রাচীন আচার ব্যবহার একেবারে যেন আর থাকে না। একটা যেন নূতন শক্তি, একটা তরুণ ভাব, দেশকে মাতাইয়া তুলিল। তথাকথিত স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন-ক্রিয়া শিক্ষিত-বৃন্দের মূল অবলম্বন। ছেলে বাপের কথা শোনে না, তার সঙ্গে মত না মিলিলে, তর্ক করে। এদেশে ইহা নূতন নহে। এই চিন্তা-স্রোত, নব কলরবে দেশকে পূর্ব্বে ছাইয়া ফেলিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার কোনও ইতিহাস নাই। কাজেই, ইহা কে বুঝিবে?

মেকলে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, সব সংস্কৃত বই একত্র করিলে, এক থাক ইংরাজী বইয়ের সমান হইবে না, এবং হিন্দুর পুরাণের ভূগোল পড়িলে, ইংরেজ বালিকাও না হাসিয়া থাকিতে পারে না। আমরাও সেই কথা মাথায় পাতিয়া লইলাম, এবং মনে করিলাম, পিতৃপুরুষ-গুলা কত কুসংস্কারই আমাদের ঢালিয়া দিয়াছেন। উদ্দাম খ্রীষ্টিয়ান কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসি হাসিয়া, পুরাণ হইতে অশ্লীল আখ্যায়িকা তুলিলেন ও তাহাতেই হিন্দুধর্ম্মের লেবেল মারিয়া দিলেন। প্রাচীনেরা ভাবিতে লাগিলেন, এ হ'ল কি? দেশ একাকার মেচ্ছ হইয়া গেল। কেহ ভাবিলেন, এই বুঝি কলির শেষ, তাই সব একাকারে হয়ে যাচ্ছে।

তারপর কি জানি কেন রুষিয়ায় এক বিদুষী রমণী মাথা তুলিলেন। তখন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়? যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, যাহা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ সিদ্ধ নহে, তাহা মানুষের গ্রাহ্য নহে। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি ক্লেয়ারভয়েনস্ ও ক্লেয়ার অডিয়েন্সের দাবী করিলেন। অর্থাৎ, মানুষের দিব্য-দৃষ্টি ও দিব্য-শ্রুতি আছে এবং ইহার দ্বারা দেবলোক

প্রেতলোক প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া যায়। ব্লাভাতস্কির মতের মূলে, হিন্দুর যোগ ও সেই সঙ্গে হিন্দুর তন্ত্র ও কিছু কিছু পৌরাণিক সৃষ্টি-প্রকরণ। বোধ হয় ১৮৭৫ সালে, এই খাঁটি দেশী জিনিস, ইউরোপীয় মস্তিষ্কে পরিপ্লুত হইয়া, আবার এদেশেই ফিরিয়া আসিল। আমেরিকায় এই মতের বেশ বিস্তার হইল, এবং অল্পে অল্পে ইউরোপেও দেখা দিল। গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরা, ইহা জাল জুয়াচুরী বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ গালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা, শুকনা কাঠে রং করিয়া, বিশ্বের যে মূর্ত্তি দেখাইতে-ছিলেন, লোকে সে মূর্ত্তিতে আর ভোলে না। টেট্ ও বালফোর ষ্টুয়াট তাহাদের "অদৃশ্য-বিশ্ব" (১) নামক গ্রন্থে দেখাইলেন যে, বিজ্ঞান বিশ্বরহস্যের কেবলমাত্র বহিরাবরণ মাত্র ভেদ করিয়াছে, ইহার পরে আরও অনেক জানিবার ও বলিবার ব্যাপার আছে।

দেশে থিওসফি আসায়, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-মূলক জ্ঞানের উপর সন্দিহান হইতে লাগিলেন। আবার ধীরে ধীরে প্রাচীন আচার ব্যবহার দেশে শিক্ষিতের মধ্যে দেখা দিল। জপ, তপ, হোম, যাগ তীর্থ-দর্শন আবার ফিরিতে লাগিল। ইহার মধ্যে আবার ম্যাক্স-মূলর হিন্দুর দিকে হইয়া, ইউরোপে উচ্চ হিন্দুমত প্রচার করিতে লাগিলেন। সপেনহর উপনিষদে তাঁহার ভাবনের শান্তি পাইলেন। গেটে, শকুন্তলার মধ্যে, বসন্ত মঞ্জরিত আগেই দেখাইয়াছিলেন এবং জোনস ও কোলব্রুক অনেক আগে হিন্দুর বীজগণিত জ্যোতিষ ও এমন কি সঙ্গীত অবধি ভাল দেখিয়াছিলেন। আবার স্রোতটা যেন অন্য দিকে ফিরিল। ম্যাক্স-মূলর আবার ভাষা-তত্ত্বের দিক হইতে ভারতবর্ষে আর্য্য-নিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রীক, জার্ম্মান ও ইংরাজদের সহিত, ভারতবর্ষের জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করিলেন। সে কোলাহল, সে উৎসাহ, যে না শুনিয়াছে ও না দেখিয়াছে, তাহার জন্মই বৃথা। তখন ইংরাজীর উপর ঝোঁক কমিল, আর ইংরাজ লেখকেরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর সে প্রভাব রাখিতে পারিলেন না। সে সময়ে কথায় কথায় সংস্কৃত কোটেশন। অন্ততঃ, ৩টি তিনটি শ্লোক না তুলিলে, মাসিক পত্রের প্রবন্ধ বেশ রুচিকর হইত না। শিক্ষিতেরা অনেকে মদ ছাড়িলেন জপে তপে মন দিলেন। বঙ্কিমবাবু নভেল ছাড়িয়া, কৃষ্ণ চরিত্র; ও স্পেনসারের ভাঁজে ও হিন্দুর ছাঁচে, ধর্ম্ম-কথা লিখিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে একটা সুফল ফলিল। দেশে একটা জাতীয়তার ভাব আসিল। পূর্ব্বে যেন লোকে ইংরাজী শিখিয়া, হিন্দু-ইংরাজ গোছ হইয়াছিল, কিন্তু এখন আবার তাহারা দেশের লোক হইল। দেশের সুখে, দেশের ভাবে, দেশের অভাবে, সকলের দৃষ্টি পড়িল। এই জাতীয় ভাবটা, দুই একটা কারণে আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, ইউরোপীয় লেখক-দের ভারতের প্রতি দ্বেষ। জার্ম্মান প্রত্নতত্ত্ববিৎ ওয়েবার হিন্দুর কিছুই ভাল দেখিতেন না। এমন কি, হিন্দুর সাধের গীতার ভক্তি-বাদটাও, তাঁর মতে খ্রীষ্টানদের কাছে ধার-করা জিনিস। কনিংহাম প্রভৃতি লেখকেরা হিন্দুর স্থপতি ভাস্কর্য্য প্রভৃতি, শিল্পে ও কলায়, গ্রীকদের অনুকরণ দেখিলেন। কোন স্বচ-দার্শনিক, সংস্কৃত ভাষাটা গ্রীক-ভাষায় জাল, তাহা বহু পূর্ব্বে বলিয়াছেন। আধুনিক লেখকেরা, সংস্কৃত নাটক, সাহিত্য ও অভিনয়ে,

(১) Unseen Universe

গ্রীক জাতির ছাপ দেখিলেন। তারপর, এখন ত আর আর্য্যদের বাসভূমি মধ্য এসিয়া নহে, এখন উহা পশ্চিম-জার্ম্মান উপকূলে। এইরূপে, ইউরোপীয় লেখকেরা এসিয়া বাসীদের, বিশেষতঃ ভারতবাসীকে, ছোট করিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় লেখকেরা নিজেদের দেশকে যত বড় করিতে লাগিলেন, শিক্ষিত-ভারত, প্রতিক্রিয়া বশে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে ততই হীন-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বলিতে সাহস হইল না।

ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম আবার জাগিয়া উঠিল। ভারতে তত না হউক, ইউরোপ ও আমেরিকায় বৌদ্ধদের "নির্ব্বাণ", "ক্ষণিক বাদের" কবির "শূন্যে" জ্বলিয়া উঠিল। সে হাওয়া এখনও বেশ জোরে বহিতেছে। দগ্ধ-কপাল ভারত, বিদেশীয় একটু আধটু প্রশংসা পাইয়া, আনন্দ বোধ করে। আবার এদিকে, বিবেকানন্দ হই একটা বেদান্তের পরিভাষা আমেরিকায় ছাড়িয়া দেওয়ায়, বেদান্ত ও উপনিষদের নামটাও পশ্চিম রাজ্যে বেশ স্বরগড় হইয়া পড়িল। আমার নামটা কর, আমাকে ভাল বল, অন্ততঃ আমার পিতৃপুরুষদের ভালবাস— ইহাতেই আমাদের কানের একটা বেশ আরাম।

এই ভাবের প্রতিক্রিয়া এখন পূরা ভাবে চলিতেছে। হাভেল সাহেব হিন্দুর স্থপতি-বিদ্যা ও ভাস্কর্য্যের মৌলিকত্ব বজায় রাখিয়াছেন। এই জন্য আমরা তাহাকে খুব শ্রদ্ধা করি। দেশ-প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও অতি-জ্ঞানী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হিন্দুদের প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক উদ্যমটা, অনেক পরিশ্রমের পর প্রচার করিয়া, জনসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এখন সকলেরই স্বদেশের দিকে ঝোঁক। তাই বাঙ্গালায় এত ইতিহাসের চর্চ্চা। পরের মুখে আর দেশের কথা শুনিতে ভাল লাগে না। এই জাগরণটা, এই নিজে দেখিয়া শিক্ষা করার চেষ্টাটা, দেশের একটা শুভ লক্ষণ। তবে ইহার পরে আবার কি আস্‌বে, কে জানে।

যে ভারত এককালে কেবল বিদেশীর মুখের কথা লইয়া চলিত, তাহাদের এরকম ভাব পরিবর্ত্তন কেন হইল? আমরা ইহাকে যুগ ধর্ম্ম বলি। পাশ্চাত্যেরা "সাইনস্ অব দি টাইমস্" বলে। ইহার মূলে কিন্তু জীব-তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব আছে। "মিউটেসনে" যেমন এক জাতীয় জীবের এক সঙ্গে কতকগুলা পরিবর্ত্তন আসিয়া জোটে, সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম-জগতেও সেইরূপ একটা কিছু আছে। বোধ হয় সেই জন্য, সকলের এক সঙ্গে, এইরূপ মানসিক ভাবের ও আদর্শের একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়।

এই প্রতি-ক্রিয়াটা এখন কতকটা চরমে উঠিয়াছে। আমরা এখন পাশ্চাত্য-সভ্যতার খুঁত ধরিতে শিখিয়াছি। খুঁতটা অনেকে আবছায়া গোছ দেখিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ইহার মূর্ত্তি কেহ সাধারণে দিতে পারেন নাই। মহাত্মা-জি বোধ হয় ইহার দ্রষ্টা। নূতন ভাবের সঙ্গে, নূতন দ্রষ্টা থাকা আবশ্যক, তবেই না ভাবের জোর। মহাত্মা জি পাশ্চাত্য সভ্যতাটাকে ভূয়ো বলে মনে করেন। যে সভ্যতায় মানুষের লক্ষ্য কেবল বিলাস, আর আমোদ, আর রেষারেষি, আর টাকা—সে সভ্যতাটা সভ্যতা কি না, এ সন্দেহ সকলেরই হতে পারে। ষ্ট্রগল্ ফর একৃসিস্‌টেন্স্ (struggle for existence) আর কম্‌পিটিসন্ (competition), মানব সভ্যতার মূল নীতি কি না, ইহা অনেক পাশ্চাত্য লেখকের এখন সংশয়ের বিষয়

হইয়াছে। নব্য-সভ্যতার আর একটা দিক আছে, সেটা একটা কুলক্ষণ। বণিক-বৃত্তি দ্বারা ধনী ব্যক্তি আরও ক্ষমতাশালী হইতেছে এবং নির্ধন একবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের ধন প্রাণ ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে। তোমার মুখের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করিব না এবং তোমাকে যত পারি খাটাইয়া আমি পয়সা করিয়া লইব। আগে শ্রমজীবীরা নিজের ঘরে নিজে বা পরিবারবর্গের দ্বারা কাজ করাইয়া লইত। তাহার শ্রমের ফল সে নিজে উপভোগ করিতে পারিত। কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। কিন্তু শ্রমজীবী তাহার সে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছে। সে এখন বেতনভোগী চাকর। তাহার এই প্রকারের ইন্‌ডিভিডুয়ালিসম (individualism) চলিয়া গিয়াছে। আমেরিকায় কলের অধিকারীরা এবং বড় ব্যবসাদারেরাই রাজত্ব চালাইতেছে। তাহাদের দেশেও এজন্য অসন্তুষ্টি। আমাদের দেশেও ধর্ম্মঘট, বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা, বেশী অধিকার প্রভৃতি যে সকল দাবি শ্রমজীবীরা করিতেছে তাহারও মূলে ঐ একই কারণ। সোসিয়ালিসম্ (socialism) বা গণ-তন্ত্র বা এক কথায়, শ্রমজীবীর অধিকতর অধিকার পাইবার চেষ্টা, পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অর্থের জন্য কত অনর্থ ঘটিয়াছে।

মহাত্মা-জি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, বোধ হয়, পাশ্চাত্য জাতির গিলটি-করা সভ্যতাটা ধরিতে পারিয়াছেন। স্পেনসার প্রভৃতির মতে, প্রকৃতিকে স্ব-বশে আনাই সভ্যতা। কিন্তু সে প্রকৃতি কেবল কি বাহিরের প্রকৃতি, না মানুষের অন্তরের প্রকৃতিটাও উহার সঙ্গে ধরিতে হইবে? তড়িৎ-শক্তি বা বাষ্প শক্তি, মানুষের কাজে লাগাইলেই যে সভ্যতা হয়, তাহা নহে। শাক্যসিংহ ও সক্রেটিস, এই দুই শক্তি ব্যবহার না করিয়াও, সভ্য ছিলেন ও সমবুদ্ধ হইয়াছিলেন। বাহিরের প্রকৃতিটা মানুষ, দরকার মত, স্ব-বশে আনিতে পারে। যে জাতি কেবল শিকার করিয়া খায়, তাহারা এক প্রকারের অসভ্য। আর যাহারা সবে কৃষি-কার্য্য শিখিয়াছে, তাহাদেরও আমরা অসভ্য বলি, তবে উন্নত অসভ্য। তাহার কারণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর অসভ্যেরা, প্রকৃতিকে একটু বশ করিয়াছে। কিন্তু মানুষের চরিত্র হিসাবে, কোন্ জাতি কতটা সভ্য, তাহা ধরা বড় শক্ত। যদি মানুষের মন না তৈয়ারী হইল, যদি সে নিজের স্বার্থের কতকটা ত্যাগ না করিতে পারিল, যদি তাহারা বণিক-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, শ্বাপদ জন্তুর মত, কামড়া কামড়ি করিল এবং নিরীহ-জাতির উপর অকারণ আধিপত্য চালাইল, এরূপ মানুষ বা মানুষের সমষ্টিকে সভ্য বলা যাইতে পারে না। মানুষের আদিম অবস্থায়, এইরূপ পশুভাবে, দুই জাতির সংঘর্ষে ও সাংকর্য্যে, একটু একটু করিয়া, আদিম মানুষ মনুষ্যত্বের সোপানে উঠিয়াছে। সে কিন্তু অন্য কারণে। এবং মানুষকে মানুষ বা সভ্য হইতে হইলে, ঠিক এ ভাবটা চলে না। বাহিরের প্রকৃতির গুপ্ত-রহস্য ভেদ করিয়া, তাহা নিজের আয়ত্ত করা, আবার এদিকে অন্তরের প্রকৃতিকেও ঐরূপে আয়ত্ত করা, সভ্যতার কাজ। আদর্শ-পুরুষেরা আমাদের কতকগুলা মানসিক-বৃত্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। খ্রীষ্ট, জরথুষ্ট্র, কনফিউসস্ সকলে একবাক্যে ক্রোধটাকে দমন করিতে বলিয়াছেন। এই ক্রোধই কিন্তু আবার আদিম মানবের জয়-বিজয়ের সহায় ছিল। একই প্রতিভা প্রকৃতির অন্তরের ও বাহিরের রহস্য বাহির করিয়াছে। মানব-জাতির উন্নতিকল্পে, দুইয়েরই আবশ্যকতা

আছে। যে সভ্যতায় অন্তরের দমন নাই, তাহা সভ্যতা নহে। মহাত্মাজি ইহা উত্তমরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। একদিকে বিলাস ও আমোদ যেমন সভ্যতা ক্ষয় করে, অপরদিকে কেবলমাত্র স্বার্থ-অন্বেষণও মানব-জীবনে ভয়ানক অনিষ্ট করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দুইটা কুলক্ষণ দেখিয়া, গান্ধী-মহারাজ বোধ হয় উহার উপর বীতস্পৃহ হইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য সভ্যতার কু অভ্যাসগুলা চড়াইয়া পড়িতেছে। আমাদের মত বিচ্ছিন্ন ও পরবশ জাতির মধ্যে, ঐ ভাবটা সংক্রামিত হইলে, আর রক্ষা নাই; তাহা হইলে ভারতবাসী লোপ পাইবে।

গান্ধীর অন্ত-দৃষ্টি আছে, কিন্তু দার্শনিক শক্তির সহিত, ঐ দৃষ্টির কতটা সমন্বয় তাহা বলা যায় না। তিনি প্রতিকার কল্পে, যে সকল উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহা কি পরিমাণে কার্য্যকরী হইবে, এইটুকুই বিবেচ্য। তিনি দেখিলেন, ভারত বৈরাগ্যের ও দরিদ্রের দেশ। এই জাতি সহরের আবর্তে পড়িয়া, বিলাসে গা ঢালিয়া গা ভাসাইয়া দিয়াছে। তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি? তিনি দেখিতেছেন, কেবলমাত্র চাকুরী অবলম্বন করিয়া, অথবা উকিল ডাক্তার হইয়া, শিক্ষিত-সমাজ প্রজার অর্থ অন্যায়ভাবে নষ্ট করিতেছে। এই সকল বৃত্তি ছাড়িয়া, তাহারা কি করিয়া খাইবে? যাহারা জীবিকা উপায়ের জন্য, তাহার উপদেশ চাহে, তাহাকে বনে যাইতে বলেন, নীচ-কর্ম্ম করিতে বলেন। এ বিষয় তিনি প্রাচীন জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন কি? আগে, জীবনের শেষভাগে বনে বাস করার একটা ব্যবস্থা ছিল। সেই সংস্কারটাই বোধ হয় তাঁর মনে আসিয়াছে। অথবা, তিনি বুঝিয়াছেন যে, মানুষ যত স্বাভাবিক অবস্থায় বাস করিতে পারে, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। তিনি একা নহেন, অনেক পাশ্চাত্য লেখক, তাহাদের নব্য-জীবনে হতশ্রদ্ধ হইয়া, সরল স্বাভাবিক ভাবে দিনপাত করার পক্ষপাতী। সেই স্বাভাবিক জীবনটুকু কি? একবারে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন অথবা আদিম মনুষ্য-জীবনের ও নব্য-সভ্যতার মাঝামাঝি কোন একটা অবস্থা লইয়া চলা। আমাদের দেশে ধর্ম্ম-জীবনের চরম অবস্থায় উঠিলে—অর্থাৎ পরমহংস অবস্থায়—মানুষ আবার নিয়মের (কন্‌ভেন্‌সনের) বাহিরে আসিয়া পড়ে ও তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-ভাবে মানুষ থাকিতে পারে। তখন জাতি বিচার থাকে না, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিষেধ থাকে না, বস্ত্র ব্যবহারের আবশ্যক থাকে না, ইত্যাদি। গান্ধী-মহারাজ কি এই প্রকারের কোন একটা আদর্শ আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিতেছেন।

৩। গান্ধী মহারাজ কল কারখানার পক্ষপাতী নহেন। রেল, ট্রাম, মোটর, ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও ফ্যান প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থা নব্য-জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সহায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মহারাজ আদৌ পছন্দ করেন না; কেননা, উহা মানুষকে একেবারে জীবনের গোলাম করিয়া তুলিতেছে। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক নিয়মের সাহায্যে, যে সকল নূতন ব্যাপার নব্য-মানব-সমাজে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে সকলই যে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, তাহা আমরা বলি না। আমরা কোন যন্ত্রের ক্রিয়া বা গতির সম্বন্ধে অঙ্ক পাতিয়া বলিতে পারি। কিন্তু জীব-অভিব্যক্তি অথবা সেই হেতু মানবের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। নীটসের অতি-মানব এবং বিবর্ত্তন-বাদীর পূর্ণাভিব্যক্ত মানুষ কিরূপ হইবে, তাহা আমাদের জ্ঞান রাজ্যের

অতীত। ইহার ব্যাপ্য-ব্যাপক-সম্বন্ধ সহ-বায় (co existance), বা ন্যায় দর্শনের মতে, অনুমানের যাহা কিছু সহায় আছে, তাহার দ্বারা মানুষে কিছুই ধরিতে পারে না। কি, কল্পনা বলে, কাঠবিড়ালী জাতীয় জীবের পরিণাম যে মানুষ হইবে, তাহা ধরা যাইতে পারে না। পরিণামের কোনও নিয়ম নাই, অন্ততঃ এখনও কিছু জানা যায় নাই। নব্য-ডার্বিনী বা নব্য-লামার্কী মতের কোনটাতেই অভিব্যক্তির মূল কারণ ধরিবার উপায় নাই। যাহা হউক, দেশটা সম্ভবতঃ একটা বাঁকা পথে যাইতেছিল, এবং গান্ধী মহারাজের প্রভাবে যদি উহা বাঁকা হইতে সোজা পথ পায়, তাহা হইলেও দেশের একটা কল্যাণ। বিলাস, মানুষের শরীরে এক রকম ঘুণ। শরীরটা নিজের কায়দায় না রাখিতে পারিলে, সমাজের পক্ষে অমঙ্গল।

অনেক পাশ্চাত্য লেখক, সভ্যতার ভিতরে জাতি-নাশের বীজ দেখিয়াছেন। ইহার অর্থ এই, মানুষের জীবনে যেমন বার্দ্ধক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার শেষ হইয়া আসিয়াছে— সেইরূপ জাতীয়-জীবনে, সভ্যতাটাও ঐ প্রকারের একটা কিছু হইতে পারে। আমাদের যে নূতন জাতীয় জীবন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সভ্যতা রূপ জাতীয় বার্দ্ধক্য প্রবেশ করান, উন্মাদের চিহ্ন বলিতে হইবে। ইউরোপ প্রায় একশত বৎসর হইল, তপশ্চর্য্যা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং উহা সন্ন্যাসের (monasticism) পশু-অবশেষ বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছে। মানুষের কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া চাই, তাহা না হইলে মনুষ্যত্বের হানি হয়। গান্ধী কেবল কথায় নয়, কার্য্যেও তাহাই দেখাইতেছেন। গান্ধীর কথায় হয়ত অনেক অসঙ্গতি থাকিতে পারে, তাঁহার প্রসঙ্গ বিচারেও দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু গান্ধী-মন্ত্রের স্থান খুব উচ্চ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মূল লক্ষ্য জাতি নির্ম্মাণে, এবং জাতি-নির্ম্মাণে, জাতীয়-শরীরে যে সকল অসুস্থতার চিহ্ন দেখিতেছেন, তাহার প্রতিকার-কল্পে তিনি যে সকল মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে স্বস্তির বীজ থাকিতে পারে। বিলাস ও সুখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে হইয়া থাকে, তাহার মূল্য মনুষ্য-জীবনে কতটুকু? মানুষ চায়, একটা কিছু যেটা সুখ নহে, বিলাস নহে—শান্তি, আনন্দ। তৃপ্তিতে শান্তি নাই, শারীরিক অভাব ত অনেক আছে, সে অভাবের পূরণ হইলে, একটা দৈহিক সুখ হয়, কিন্তু উহা মানব-সন্ততির (race) পক্ষে কল্যাণকর নহে। রেসের কল্যাণের জন্য স্বতন্ত্র-ব্যবস্থা, ইহার নীতি, সাধারণ-নীতি হইতে পারে না।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

———

বাসনা।

আমি চাই ক্ষুদ্র ফুলটীর মত
পবিত্র, সুরভি হ'তে,
আমি চাহি শুধু আপনা ভুলিয়ে
সুবাস বিলায়ে দিতে।
(চাই) নিভৃতে ফুটিয়া, সাধনা সাধিয়া,
নীরবে ঝরিয়া যেতে
কুমুদের মত, প্রতিদান ভুলে,
প্রেমে আত্মহারা হ'তে।
তটিনীর মত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া
অনন্তে মিশিতে চাই
নীল নভোস্থলে ধ্রুবতারা মত
স্থিরলক্ষ্য হয়ে রই।
জ্যোছনার মত স্নিগ্ধ নির্ম্মল
সমুজ্জ্বল হতে সাধ।

ভুলে যেতে চাই জগতের তুচ্ছ
অভিমান বিসম্বাদ।
জুড়াইতে চাই তপ্ত ধরা বক্ষ
সলিলের শৈত্য লয়ে,
অন্যের মালিন্য ধুয়ে দিতে সাধ
নিজ অশ্রুধারা নিয়ে।
আকাশের মত প্রশস্ত প্রশান্ত
যেন এ হৃদয় হয়
সত্য, ধর্ম, প্রেম, তিতিক্ষা বিশ্বাসে
যেন সদা উজলয়।
তোমারি কাজেতে, ওহে জগদীশ,
আপনা সঁপিতে চাই;
(আমি) আর সব ভুলি, শুধু তুমি নাথ
বিরাজ এ হৃদি ঠাঁই।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

কোচবেহার।

(৩০ পৃষ্ঠায়, 'তিনটি স্বাধীন রাজ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

৪১১ বৎসর পূর্ব্বে, কোচবেহারের বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। কোচবেহারের সঙ্গে ত্রিপুরা ও ময়ূরভঞ্জের সম্পর্ক আছে। বর্ত্তমান মহারাজা বরোদার রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন। জলপাইগুড়ীর রায়কত, পাঙ্গরে জমিদার, গোয়ালপাড়া জেলার পর্ব্বত জোয়ার, রূপসী, লক্ষ্মীপুর, বিজনী ও আসামের দরঙ্গ ও বৌলতলির জমিদারগণ এই একই জাতিভুক্ত।

বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদের কামরূপ আক্রমণ কালে, কোচবেহার রাজ্য আসামের অধীনে ছিল। পরে ১৪০০ হইতে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, কোচবেহারের দীনহাটা মহকুমার কামতাপুর, বর্ত্তমান গোঁসাইমারী নামক স্থানের রাজধানীতে, খ্যেন বংশীয় তিনজন রাজা অতি প্রবল পরাক্রমের সহিত কোচবেহার ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করেন। প্রথম রাজার নাম নীলধ্বজ, দ্বিতীয় চক্রধ্বজ ও তৃতীয় নীলাম্বর। গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হোসেন সাহা শেরিফ মক্কি, দ্বাদশ বর্ষের মহাযুদ্ধের পরে, অবরোধিত কামতাপুর ও রাজা প্রজা ধ্বংশ করিয়া রাজ্যের

লোপ করেন। এখন ধল্লা বা শিংমারী নদীর তীরে, ২০ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায়, কোচবেহারের কোন ব্রাহ্মণ নৌকারোহণে কামতাপুরের নিকটবর্ত্তী ধল্লানদী বাহিয়া যাওয়ার সময় দেখিতে পান যে, একটী ঘর ভাঙ্গিয়া স্বর্ণমোহর নদীতে পড়িতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে নৌকা লাগাইয়া, মোহরে নৌকা পূর্ণ করেন। তিনি পরে কোচবেহারের একজন প্রধান জমিদার হইয়াছিলেন। কমতেশ্বরগণের শাসন সময়ে, কামরূপের চিকনা পাহাড়ে হাজো নামে এক কোচ সর্দ্দার বাস করিত। হাড়িয়া নামক এক কোচের সহিত হাজোর-কন্যা হীরা ও জীরার বিবাহ হয়। জীরার পুত্র মদন ও চন্দন ও হীরার পুত্র শিশু ও বিশুসিংহ। প্রবাদ আছে যে, এই সকল পুত্রগণ মহাদেব প্রভুর ঔরসজাত, কোচবেহারের রাজবংশের সৃষ্টির জন্য,৪১১ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কোচবেহার রাজবংশের সভা-পণ্ডিত কোনও ব্রাহ্মণ-রচিত যোগিনী-তন্ত্র নামক তন্ত্রে এই সমস্ত বর্ণিত আছে ও ইহা হইতেই বঙ্গদেশে মহাদেবের কোচনীপাড়ার লীলার সৃষ্টি হইয়াছে। চিকনা পাহাড়ের ভূম্যাধিকারির সঙ্গে যুদ্ধে মদন নিহত হন ও চন্দন ১৫১০ খৃষ্টাব্দে চিকনা পাহাড়ে প্রথম কোচ রাজা হইলেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পরে, বিশু সিংহ রাজা হইলেন। ১৫৫৪ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। ইনি সমস্ত গোয়ালপাড়া ও রঙ্গপুর, কোচবেহার এবং জলপাইগুড়ি অধিকার করেন। শিশু সিংহ মন্ত্রি হইলেন। ইনি বৈকুণ্ঠপুরে রাজধানী স্থাপন করেন ও জলপাইগুড়ির রায়কতগণ ইঁহারই বংশধর। বিশ্বসিংহের দুই পুত্র, মহারাজা নরনারায়ণ অপর নাম মল্ল এবং শুক্লধ্বজ বা চিলা রায়। চিলের ন্যায় শত্রুর উপরে বেগে পতন হেতু নাম চিলা রায়। মহারাজা নরনারায়ণ কোচ-বেহারের প্রথম রাজা ও ইনিই কোচবেহার নগর নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে, গোয়ালপাড়া জেলার পর্ব্বত জোয়ারের বনে আঠারকোঠায় ইহাদের রাজধানী ছিল। ইনি টাকশাল স্থাপন করেন ও সোনার ও রূপার নারাণী টাকা প্রথম প্রচলিত করেন। এই মুদ্রা বহুকাল পর্য্যন্ত উত্তর বঙ্গ ও আসামের মুদ্রা ছিল। শুক্লধ্বজ মহাবীর ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে নর-নারায়ণ কাছার পর্য্যন্ত অধিকার করেন ও ভুটানের দুয়ার দখল করেন। ইনি কামরূপে কামাখ্যার নষ্ট-মন্দির উদ্ধার করিয়া নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন ও মন্দির গাত্রে শিলালিপি রক্ষা করেন। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার ও স্থপতির মূর্ত্তি, মন্দির-গাত্রে খোদিত করেন। শুক্ল-ধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণ, হাবড়া ঘাট ও খুন্টা ঘাট অর্থাৎ বিজনীর প্রথম রাজা এবং তাঁহার বংশধরগণই আসামের দরং ও বেলতলির রাজা ছিলেন। মহারাজা নরনারায়ণের সভা-পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, ঐ অঞ্চলের পাঠ্য রত্নমালা নামক বিখ্যাত ব্যাকরণ রচনা করেন। শঙ্করদেব ও দামোদর দেব মহাপুরুষগণের প্রভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-রাজ্য আলোকিত করে। ১৫৫৫ হইতে ১৫৮৭ পর্য্যন্ত, মহারাজা নরনারায়ণ রাজত্ব করেন। এই সময়ে কালা পাহাড় কামাখ্যা পর্য্যন্ত মন্দির ধ্বংস করেন। নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মী নারায়ণ রাজা হন।

১৫৮৭ হইতে ১৬২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ রাজত্ব করেন। ষ্টুয়ার্ট রচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ইহার রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রনদ, দক্ষিণে,

ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত, ও উত্তরে তিব্বতের (ভোট) পর্ব্বত ও আসাম। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী ও এক সহস্র যুদ্ধ-নৌকা ছিল। ইঁহার রাজত্বের প্রথমাংশে, সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন ও লক্ষ্মীনারায়ণ আকবর বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহাতে রাজার আত্মীয়গণ ও প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে ও বাধ্য হইয়া তিনি দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি জেহাজ খাঁ আসিয়া বিদ্রোহী দমন ও লুট-পাঠ করিয়া ফিরিয়া যান। জাহাঙ্গির বাদসাহের সময় কিছুকাল যুদ্ধের পরে, রাজা দিল্লী গমন করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। ইঁহার ১৮ পুত্র ছিল ; তন্মধ্যে বীরনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন ও মহীনারায়ণ নাজির হইয়াছিলেন। নাজির সেনাপতি ছিলেন ও দেওয়ান মন্ত্রী।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে, বীরনারায়ণ রাজা হন, ও ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে, মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সময়ে ভুটিয়ারা প্রবল হয় ও রায়কতগণ রাজস্ব বন্ধ করেন।

অতঃপর, তৎপুত্র প্রাণনারায়ণ ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নবাব ইছলাম খাঁ কোচবেহার আক্রমণ করেন। পুনরায় ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, সুবিখ্যাত মীরজুম্লা কোচবেহার অধিকার করেন। রাজা ভোটানে পলাইলেন। প্রাণনারায়ণের পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও মোগলদিগের সাহায্য করেন। মীরজুম্লার মৃত্যুর পরে, প্রাণনারায়ণ কোচবেহার পুনরায় অধিকার করেন। প্রাণনারায়ণ সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তিনি জল্পেশ্বর ও বানেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই সকল মন্দিরের ভাস্কর্য্য প্রশংসনীয় নহে। মোদ নারায়ণ প্রাণনারায়ণের পরে রাজা হইলেন।

মোদনারায়ণ ১৬৬৫ হইতে ১৬৮০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্ব কালে, মহীনারায়ণ স্বয়ং রাজ্য লাভের চেষ্টা করেন কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন। তাহার পুত্রগণ ও ভুটিয়াগণের সাহায্যে রাজ্য দখলের চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হন।

মোদনারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাহার ভ্রাতা বাসুদেব রাজা হইলেন। ১৬৮০ হইতে ১৬৮২ পর্য্যন্ত ২ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে নাজীর মহীনারায়ণের পুত্রগণ ভুটিয়াদিগের সাহায্যে পুনরায় কোচবেহার আক্রমণ করেন। এবং ভুটিয়াগণ বিশ্বসিংহের সিংহাসন তরবারি প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। জলপাইগুড়ী হইতে রায়কতগণ আসিয়া ভুটীয়াদিগকে দূর করেন। মহীনারায়ণের পুত্রগণ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া বাসুদেবকে বধ করেন।

অতঃপর, প্রাণনারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ, ১৬৮২ হইতে ১৬৯২ পর্য্যন্ত, রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্ব সময়ে, রঙ্গপুর-জেলাস্থিত, চাকলা ফতেপুর ও কাজিরহাট ও কাকিনা, মুসলমানগণ অধিকার করেন ও পাঙ্গাপরগণার ও জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারগণ কোচবেহারের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া মোগলদিগকে রাজস্ব দেন। টেপা মধুপুর, মন্থনার জমীদারগণ ও মোগলগণকে রাজস্ব দেন। কাজির হাট ও কাকিনা বর্ত্তমান কাকিনা রাজ্যের জমিদারি। মোগলগণ চাকলা বোদা, পাট-গ্রাম ও পূর্ব্ব-ভাগ অধিকারের

চেষ্টা করেন। এই সমস্ত পরগণা বর্ত্তমান সময়ে কোচবেহারের জমিদারী, গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হয়। মহীনারায়ণের পুত্র শান্তনারায়ণ ছত্র-নাজীর হইলেন। ছত্র-নাজির সেনাপতি এবং অভিষেক সময়ে রাজার মস্তকোপরি ছত্র ধরেন।

মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর, শান্তনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র, রূপনারায়ণ, ১৬৯৩ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রাজত্ব করেন। এবং তাঁহার ভ্রাতা সত্যনারায়ণ নাজির হইলেন। অর্থাৎ মহীনারায়ণের বংশের একজন রাজা, একজন মন্ত্রী ও তৃতীয় সেনাপতি হইলেন। এই সময়ে, নাজির শান্তনারায়ণ, বলরামপুর স্থাপন করেন ও তথায় বলরাম-বিগ্রহ স্থাপিত করেন। এই বলরামপুর পঞ্চক্রোশ খ্যাত, এবং কোচবেহারের মধ্যে হইলেও, রাজ-শাসন বহির্ভূত ছিল। মহারাজ রূপনারায়ণ সুবিখ্যাত মদনমোহন বিগ্রহ স্থাপন করেন।

অতঃপর, মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণই ১৭১৪ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় হইতে কোচবেহার ক্রমশঃ ভুটিয়াগণের অধীন হইয়া পড়ে। মোগলগণ কোচবেহার লুণ্ঠন করে কিন্তু ভুটিয়ারা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

উপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ, ১৭৬৩ হইতে ১৭৬৫ পর্য্যন্ত, নাবালক অবস্থায় রাজত্ব করিয়া কাল প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ভুটিয়াগণ কতক সৈন্যসহ কোচবেহার শাসন করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন ও চাকলা বোদা প্রভৃতির রাজস্ব কোম্পানী গ্রহণ করেন। রতিশর্ম্মা নামক একব্যক্তি এই রাজাকে হত্যা করে।

অতঃপর ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্ব সময়ে ভুটিয়ারা সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া রাজা ও দেওয়ানকে ভুটানে ধরিয়া লইয়া যায় ও ভুটানের দেবরাজার ভাগিনেয় জীমেপ ২০,০০০ সৈন্যসহ কোচবেহারে আগমন করিয়া ধীরেন্দ্র-নারায়ণকে রাজা করেন। নাজীর দেওকে ইহারা তাড়াইয়া দেয়। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণাপন্ন হইলে, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজার সহিত কোম্পানীর এক সন্ধি হয়। তৎকালের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ চিরস্থায়ী কর ধার্য্য হয়। কোম্পানীর সৈন্য আসিয়া ভুটিয়া দিগকে তাড়াইয়া দেয় কিন্তু এই অবধি কোচবেহার রাজ্য ইংরেজ ও ভুটিয়া উভয়ের অধীনে হইল। ১৮৬৪ সালে, ভুটিয়াগণ দুয়ার হইতে বিতাড়িত হইলে, কোচবেহার তাহাদের পাশ ছিন্ন করে। ভুটিয়াগণ কোচবেহারের রাজগণকে বাপরাজা বলিত ও কোম্পানীর সহিত তাহাদের সন্ধি হওয়াতে তাহারা রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রকে ছাড়িয়া দেয়। যেখানে তিনি প্রথম ভাত খান, সেই স্থানের নাম-রাজা-ভাত-খাওয়া। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম উপলক্ষে, দেবরাজা রাজা-ভাত-খাওয়া অন্নপ্রাশন জন্য দান করেন। ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের জীবদ্দশায় ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পরে হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়া, ১৭৮৩ হইতে ১৮২৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ভুটিয়াগণ বিশেষ বলিষ্ঠ। তাহাদের অক্ষর সংস্কৃতমূলক ও ক, খ, প্রভৃতিই ব্যবহার। অক্ষরের আকৃতি অন্যরূপ। তাহাদের ভাষা তিব্বতের ভাষার অনুরূপ। ভুটানের রাজধানী পুনাখা ও তাসিসুদন। পুনাখা দেবরাজার রাজধানী এবং তাসিসুদন ধর্ম্মরাজার রাজধানী।

ধর্ম্মরাজা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় দেখেন। ভুটিয়ারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু মহাকাল অর্থাৎ শিবকেও মানে। অনেকে জল্পেশে পূজা দেয়। ইহারা প্রায় সমস্ত মাংসই খায়। শীত কালে, ইহারা ভোট কম্বল, কস্তুরী, টাঙ্গন ঘোড়া, সোহাগা পশুলোম, ভোট-ছোরা প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয়ার্থ ইংরেজ এলাকায় আনে এবং বিনিময়ে লবণ প্রভৃতি নেয়।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ—

এই সময়ে সুবিখ্যাত গুডল্যাড অর্থাৎ ভাল-বালক সাহেব কোচবেহারের বিধাতা ছিলেন। গুডল্যাড ভাল বালকই ছিলেন। নলডাঙ্গার কাশীকান্ত লাহিড়ী খাসনবীশ পূর্ব্বোক্ত সন্ধির মূল কারণ ও তিনিই কোচবেহারের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে নাজির দেও গোলমাল করেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ, ডগলাস সাহেব কোচবেহারে কমিশনর হইয়া নাবালক রাজার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে কোচবেহারে ব্রিটিশ শাসননীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়; কিন্তু নিস্ফল চেষ্টা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে কোম্পানী কোচবেহারে নারায়ণী টাকার মুদ্রন বন্ধ করিয়া দেন। ইহাঁর রাজত্বে কোচবেহারে ফাঁসি প্রচলিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান একমাত্র হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার কারণ এই যে, কোচবিহারের মুসলমানগণ হিন্দু-বংশ-জাত ও সকলেই নস্য উপাধিবিশিষ্ট। নস্য অর্থ নষ্ট। বিচারবিভাগ, পুলিশ ও আবকারী ও ডাকবিভাগের সৃষ্টি হয়। সাগরদীঘি নামক সুবৃহৎ দীঘি ১৮০৭ খৃঃ কোচবেহারে খনন করা হয়। এই দীঘি বর্ত্তমান সময়ে ৮৯০ ফিট দীর্ঘ ও ৬১০ ফিট প্রশস্ত। কাশীধামে মহারাজার মৃত্যু হয় ও এই সময় হইতে কোচবেহার রাজবংশীয়গণের কাশী-বাস আরম্ভ হয়।

হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ অতঃপর রাজা হইয়া, ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভুটিয়াগণ বরাবর কোচবেহার সীমান্তে উপদ্রব করিতে থাকে। এই সময়ে নলডাঙ্গার কালীচন্দ্র লাহিড়ী প্রথমে জজ ও পরে দেওয়ান হন। ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন ও স্বপাক খাইতেন। কথিত আছে যে, একদিন ইনি রন্ধন করিয়া খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে রাজার ভৃত্য ডাকিতে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করে। লাহিড়ী মহাশয়ের আহার হইল না, কারণ রাজবংশি অনাচরণীয় জাতি। তিনি আবার রন্ধন করিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া স্বজাতীয় একজন উচ্চ কর্ম্মচারি প্রেরণ করিলেন। ইনি গৃহে প্রবেশ করাতে পুনরায় অন্ন নষ্ট হইল ও আবার রন্ধন হইল। এইবার স্বয়ং রাজা আসিলেন। অন্ন প্রস্তুত, লাহিড়ী মহাশয় ভাবিলেন রাজা দেবতা ও শিব-সন্তান। ইনি ঘরে আসাতে দোষ নাই। গণ্ডুষ করিয়া যেই আহারে প্রস্তুত, অমনি উপর হইতে চালের কালঝুল পড়িয়া সমস্ত অন্ন নষ্ট হইল। তখন তাঁহার জ্ঞান হইল। শিবেন্দ্র নারায়ণ সু-কবি ছিলেন; তাহার রচিত অনেক ধর্ম্ম-সঙ্গীত এখনও প্রচলিত আছে। ইনিও কাশী-প্রাপ্ত হন। ইহার সন্তান না থাকায়, নাজির দেও বংশ হইতে নরেন্দ্র নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। বেনারস কালীবাড়ী ও ছত্র ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইনি নির্ম্মাণ শেষ করেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৪৭ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। নাবালক কালে মুর নামে এক সাহেব ইহার শিক্ষক ছিলেন। পরে ইনি কৃষ্ণনগরে ও কলিকাতায়, বিখ্যাত

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করেন। ভুটিয়াগণ আবার উপদ্রব আরম্ভ করে। রঙ্গপুরের সহিত সীমানার গোলমাল হইয়া নিষ্পত্তি হয়। ১৮৬১ সালে কাপ্তান জেঙ্কিন্সের নামানুসারে জেঙ্কিন্স স্কুল নামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬২ সালে দত্তকের সনদ প্রাপ্ত হন। মাত্র ২২ বৎসরে ইহার মৃত্যু হয়। ১৮৬৩ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত, ভুপেন্দ্রনারায়ণ রাজত্ব করেন।

নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর সময় ভুপেন্দ্রনারায়ণ শিশু ছিলেন। মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ ২ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কতক লোকে যতীন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ভাঙ্গর আই ও দেওয়ান নীলকমল সান্যাল, নৃপেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন। কর্ণেল হটন কোচবেহারের কমিশনর হইলেন। নীলকমল সান্যালের মৃত্যুর পর, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কালিকাদাস দত্ত কোচবেহারের দেওয়ান হইলেন। ইনি বি, এল ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি অতি বুদ্ধিমান ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। নাবালক মহারাজার বিদ্যাশিক্ষার ভার নেলার সাহেব ও বাবু ব্রজেন্দ্র মোহন দাসের প্রতি অর্পিত হয়। বাবু প্রিয়নাথ ঘোষও মহারাজার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। মহারাজার রাজ্য-ভার প্রাপ্তির পরে, ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি কোচবেহারে চাকুরি স্বীকার করেন। ব্রজেন্দ্রবাবু ও নেলার সাহেব চাকুরি গ্রহণ করেন নাই। নেলার বিলাত চলিয়া যান ও ব্রজেন্দ্র বাবু পাটনায় ওকালতি করেন। ইহার বেশ পসার হইয়াছিল। ইনি বিশেষ ধার্ম্মিক ও বদান্য ব্যক্তি, এক্ষণে বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তীর্থ-বাস করিতেছেন। ইহার পুত্র সুরেন্দ্রমোহন, পাটনা হাইকোর্টের উকীল। কর্ণেল হটন কোচবেহারের কমিশনর হওয়ার পরেই, ভুটান-যুদ্ধ হয়। কর্ণেল রসদ ও ভারবাহী পশুর ও কুলির ব্যবস্থা করেন এ জন্য নন্দকুমার রচয়িতা বিভারিজ সাহেব ডেপুটি কমিশনর হইলেন। কাবুল যুদ্ধে কর্ণেল সাহেবের এক হাত কাটা যায় ও নায়ক হেদাতালী তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এজন্য ভুটান-যুদ্ধের সময় কর্ণেল সাহেব হেদাতালীকে ৬০০ কোচবেহার সৈন্যের অধিনায়ক ও কাপ্তান করিয়া যুদ্ধে পাঠান। তৎপরে হেদাতালী ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে কোচবেহারের সুবাদার হইয়াছিলেন, ইহার নিবাস পাটনার নিকটবর্ত্তী দানাপুর এবং ইহার নামানুসারে ভুটানের দুয়ারে আলিপুর স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে একটী সবডিভিজন। আলিপুর জলপাই-গুড়ী জেলায়। কর্ণেল হটনের সময় কোচবিহার রাজ্যের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর সূত্রপাত হয় এবং পরে কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ সমস্ত বিষয়ই শৃঙ্খলা বদ্ধ করেন, ও যতদূর সম্ভব ব্রিটিশ শাসননীতির অনুকরণে কার্য্য হয়। উপযুক্ত আইনজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ বিচারকার্য্য পরিচালনা করেন, এজন্য বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে একমাত্র কোচবেহার ডিক্রী গবর্ণমেণ্টের আদালত সমূহে জারী হইয়া থাকে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর রাজ্য-গ্রহণ করার পরে, কর্ণেল গর্ডন, উই, লাউইস ডি, আর, লাল প্রভৃতি অবসর-প্রাপ্ত কমিশনর ও ডেন্টিন মিলিগান প্রভৃতি সিবিলিয়ানগণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিয়াছেন। মহারাজা কিছুকাল কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ শিক্ষক ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ মহারাজার পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট ও পরে দেওয়ান

হইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, ৺নৃপেন্দ্রনারায়ণ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, ইনি সাবালক হইয়া রাজ-সিংহাসনাধিকার করেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজার রাজত্বকালে কোচবিহারে কাউন্সিল স্থাপিত হয়। অডিট বা সুমার, আবকারী, শিক্ষা-বিভাগ, দেওয়ানি, ফৌজদারী, পুলিশ, পূর্ত্ত প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের সৃষ্টি হইয়া উপযুক্ত কর্ম্মচারি নিযুক্ত হয়। কোচবেহারে পূর্ব্বে রাজ-বাড়ীতে খড়ের ঘর ছিল, কিন্তু এই মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সময়ে বিশাল প্রাসাদ, বাজার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজা ইংরেজ-সৈন্যের কর্ণেল ছিলেন। ইনি টীরা যুদ্ধের সামানা রসদ লুটের সময় যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ও C. B. উপাধি লাভ করেন। মহারাজা G C S. I উপাধি লাভ করেন। মহারাজা একজন প্রধান ফ্রি ম্যাসন ছিলেন ও কোচবেহারে একটী লজ স্থাপন করেন। রাজার প্রাসাদ নির্ম্মাণে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ও সুশোভিত করিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, মহারাজা কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়া ক্লাব স্থাপন করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, তিনি দার্জ্জিলিঙ্গে লাউইস জুবিলি সেনিটরিয়ম স্থাপন জন্য ভূমি ও অট্টালিকা দান করেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কোচবেহারে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন। এই কলেজে প্রথম হইতেই M-A ও ল পর্য্যন্ত পড়া হইত ও বেতন গৃহীত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে, ল ক্লাস উঠিয়া গিয়াছে ও বেতন গৃহীত হয়। প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন—জে,'সি, গডলি সাহেব। ইনি এক্ষণে, পঞ্জাবের ডাইরেক্টর অব পাব্লিক ইনসষ্ট্রাকসন হইয়াছেন। তৎপরে সুবিখ্যাত আর্ডেন উড সাহেব প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইনি পরে, কলিকাতার লা মার্টিনিয়ার কলেজের প্রিন্সিপাল ও বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন। তৎপরে ডি লা ফস সাহেব, ইনি এলাহাবাদের ডাইরেক্টর অব্ পাব্লিক ইনষ্ট্রাকসন। তৎপরে, সুবিখ্যাত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও ভাসবানী প্রভৃতি লোক প্রিন্সিপাল হন। বহুদরিদ্র ছাত্র শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়। অনেক ছাত্রের পরীক্ষার ফিস সরকার হইতে দেওয়া হইত। বদান্যতার জন্য মহারাজা চির-প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯১১ সালে ইঁহার মৃত্যুর পরে, রাজেন্দ্র-নারায়ণ রাজা হন।

৺প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় অতি বিচক্ষণতার সহিত দেওয়ানের কার্য্য করেন। ইনি অতি অমায়িক লোক ছিলেন। তৎপরে, নরেন্দ্রনাথ সেন বি-এল, বার-অ্যাট-ল মহাশয় দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার সুধী ও নিধি সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এজন্য ইণ্ডিয়ান-মিরর-সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত গোলমাল বশতঃ ইঁহাকে কলিকাতায় 'নন্দীবাবু' বলিত। ইনি ইংরাজী ও আইনে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন ও বৃদ্ধ-বয়সে মহারাজা বাহাদুরের সঙ্গে বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। ইঁহারই চেষ্টায়, ধ্বংসোন্মুখ কলেজ রক্ষা পায়।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজা অতি উদার চরিত্র, স্বজন-পরিজন-পোষক ও সুশিক্ষিত ছিলেন। শিকার, পলো প্রভৃতি বীরোচিত ক্রীড়ায় ইনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন। ইনি অতি বলশালী ও মল্লযুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার চার পুত্র ও তিন কন্যা। মৃত্যুর পরে, প্রথমপুত্র রাজা রাজেন্দ্র-

নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায়, অল্প বয়সে ইঁহার মৃত্যু হওয়ায়, দ্বিতীয় পুত্র, জীতেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছেন। ইনি বারোদার বর্ত্তমান গুইকোয়ার দুহিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহের কিছু পরেই বহুমূল্য অলঙ্কার চুরি হইয়া রাজ্যমধ্যে বিলক্ষণ গোলযোগ হয়; কিন্তু হৃত-দ্রব্যের অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছিল। নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণের মধ্যে এখন মাত্র মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ও প্রিন্সভিক্টর নৃত্যেন্দ্র-নারায়ণ জীবিত আছেন। ভিক্টর বেশ বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। ইঁহাদের বিষয় অধিকাংশ লোকেই জানেন, সুতরাং আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু।

স্বরাজ।

। তৃতীয় পৃষ্ঠায় আরব্ধ প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি।

(৬)

স্বরাজের কথা বলিবার পূর্ব্বে, রাজ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা পরিষ্কার করিয়া নেওয়া দরকার। সেই প্রসঙ্গে, রাষ্ট্র ও অরাজক-সমাজ এ উভয়ের কিছু আলোচনা করিতে চাই। সভ্যতার কেবল শৈশবে, এক শ্রেণীর লোক স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। এক স্থানেতে মানুষের উপযোগী আহার্য্য ও পানীয় পালিত পশুর উপযোগী খাদ্য, ও বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী উপকরণ পাওয়া গেলেও, সেই শ্রেণীর মানুষ সেই স্থানেতে আবদ্ধ না থাকিয়া, স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। আবার অপর শ্রেণীর মানুষ, স্থান বিশেষ পছন্দ করিয়া নিয়া, তথায় গৃহস্থ হইয়া বাস করিত। যাযাবর মানুষে ও গৃহস্থ মানুষে সংগ্রাম লাগিত। কিন্তু, কি যাযাবর কি গৃহস্থ, কোনও দলেরই নিকট তখন ভূমি দুষ্প্রাপ্য ছিল না। মাটির জন্য তখন তেমন কাড়াকাড়ি ছিল না। আজকাল এদেশে চা-বাগানের সাহেবদের যেমন, তখন তেমনই মানুষের বেশী লোভ ছিল মানুষের উপর, মাটির উপর তত নয়। তখন মাটির চেয়ে মূল্যবান ছিল, মানুষ ও মানুষের শ্রম। দলবদ্ধ হইয়া মানুষ বাস করিত। কাজেই, আগে গড়িল দল (tribe)। দল যখন কোনও দেশে স্থায়ী অধিবাসী হইল, তখন গড়িল রাষ্ট্র (state)। সভ্যতার ইতিহাসে, পূর্ব্বে দলপতি, পরে রাষ্ট্রপতি।

এক রাষ্ট্রে সদৃশ ভাষা, সদৃশ ধর্ম্ম, সদৃশ আচার ব্যবহার, সদৃশ রীতিনীতি হইলে, তবে সে রাষ্ট্রের লোক এক জাতি বা "নেশান্" (nation) বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এক রাষ্ট্রের লোকের মধ্যে যদি ভাষায় ধর্ম্মে বা রীতিনীতিতে বিভিন্নতা অতিমাত্রার অধিক হয়, তবে সে রাষ্ট্রের লোককে একজাতি বা "নেশান" বলিবার সার্থকতা কিছুই থাকে না। সে রাষ্ট্রের

লোকেরা, তেমন জমাট বাঁধিয়া এক জাতি বা "নেশান" না হওয়া পর্য্যন্ত, নিজেরা নিজেরা সামান্য কারণে দল পাকাইয়া কলহ দ্বন্দ্ব করিবে। ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে, অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারী এইরূপ এক রাষ্ট্র ছিল। তথায় রাষ্ট্রপতি এক ছিল বটে, কিন্তু লোকেরা ছিল, অন্ততঃ তিনটি নেশান বা জাতি। সেই জন্যই যুদ্ধে পদে পদে অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারীর এত দুর্গতি হইয়াছিল। গত শতবর্ষ ধরিয়া বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যে এত অশান্তি, এত রক্তপাত,—আজ এ কোণ খসিয়া পড়িতেছে, কাল অপর কোণ খসিয়া পড়িতেছে,—তাহাও এই কারণে। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সদৃশ ভাষা, সদৃশ ধর্ম্ম, সদৃশ রীতিনীতি লইয়া লোকদের এক জাতি গড়িবার সুযোগ থাকিলেও, তাহারা যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভূত হয়, তাহারা এক জাতি বা 'নেশান্' হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত, প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকেরা। আধুনিক ইতিহাসে তাহার এক দৃষ্টান্ত, জার্ম্মানির ও অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মান লোকগণ।

ভাষায় মিল না থাকিলে, ভাবের বিনিময়, পরস্পরে আদান প্রদান, কঠিন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষ, একের অধিক ভাষা বড় একটা শেখে না। চেষ্টা করিয়াও, একটী বই দুইটী ভাষা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছে, এমন মানুষ খুব বেশী দেখা যায় না। একাধিক ভাষা আয়ত্ত করা থাকিলেও, শরীর বা মন যখন অসুস্থ ও স্ফূর্ত্তিহীন হয়, তখন, মাতৃভাষা ছাড়া অপর ভাষার কথা বলিতে পারিলেও, মানুষ বলিতে চায় না। আমার মনে আছে, ১৯০৮ সালে, যখন মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে লণ্ডনে অসুস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার এক পরম বন্ধু বাঙ্গালীকে তিনি বলিয়াছিলেন—"কেহ যদি আমার সহিত এখন মারাঠীতে কথা বলিতে পারিত, আমি কি আনন্দ পাইতাম; এ শরীরে এখন আর ইংরাজী কথা শুনিতে বা বলিতে মন যায় না। আমার সহিত মারাঠীতে কথা বল।" চেষ্টা করিয়া দেশবাসী সকলে বহু-ভাষাবিৎ হইবে, এরূপ আশা করা বৃথা। চেষ্টা করিলেও, ৺হরি নাথ দের ন্যায় বহু-ভাষাবিৎ পৃথিবীতে অতি অল্পই হইতে পারে। সেই জন্য মনে রাখিতে হইবে, জাতি-গঠন ব্যাপারে ভাষার একতা, একটা বড় কথা। আরও, শতকরা অন্ততঃ ৯০ জন বাঙ্গালী, দেখা হইলে, শতকরা ৯০ জন মান্দ্রাজীর সহিত ভাব-বিনিময় করিতে গিয়া, মুস্কিলে পড়িবে। বিন্ধ্যাচলের উত্তরে আর্য্যাবর্ত্তে অনেক স্থানেই শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন প্রকারে ভাঙ্গা হিন্দি বলিয়া কাজ চালাইতে পারে। কিন্তু, দাক্ষিণাত্যে,—তেলেগু, তামিল ও কাণেড়ী ভাষার দেশে,—ভাঙ্গা-হিন্দীতে সাধারণ কাজও চালান যায় না। খাওয়া, পরা, ও সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবনের জন্য, একজন অপরের সহিত, মাত্র সামান্য কয়েক শত শব্দের সাহায্যে কথা বলে। সেই কয়েক শত শব্দ দুই জনে বুঝিলেই, দৈনিক জীবনের সাধারণ কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু, ধর্ম্ম-নীতি বা রাষ্ট্রশাসন-নীতি ব্যাপারে বা স্বদেশ-সেবার কার্য্য চালাইতে হইলে, শুধু ঐ কয়েকশত শব্দে কুলায় না।

সকল মানুষের প্রকৃতিতে, দেবভাব ও পশুভাব উভয়ই আছে। যে মানুষ এক সময়ে দেবভাব-পূর্ণ হইয়া সত্য, ন্যায়, দয়া, প্রীতি, পবিত্রতা, স্বার্থত্যাগ ও ক্ষমার আদর ও সাধনা করিতেছে, সেই মানুষই আবার সময়ে প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা

ও ঈর্ষ্যাদ্বেষে পূর্ণ হইয়া পশুর মত চলিতেছে। পশু-ভাব সংযত করিয়া, ধর্ম্ম কখনও বা মানুষকে শাসন দ্বারা মানুষ-নামের যোগ্য করিয়া তুলিতেছে। আবার কখনও বা, ধর্ম্ম, মানুষের দেব-ভাব পোষণ করিয়া, মানুষকে দেবতুল্য করিতেছে। ধর্ম্মের প্রধানতঃ এই দুই কাজ—নিবর্ত্তনা, প্রবর্ত্তনা। সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবনে, নিবর্ত্তনাই ধর্ম্মের প্রধান কাজ। সচরাচর আমরা মানুষ দেখিতে পাই, দেবতা দেখিতে পাই ক্বচিৎ। ব্যক্তিগত জীবনে, দেব প্রকৃতির পোষণ অপেক্ষা পশুপ্রকৃতির শাসন, চোখে পড়ে বেশী। ধর্ম্ম-সমাজ লোকের আচার ব্যবহার রীতিনীতি বাধিয়া দিয়া, ধর্ম্মের এই নিবর্ত্তনার কাজ ব্যক্তিগত জীবনে সুসিদ্ধ করিবার প্রয়াস পায়। শাসন দ্বারা, নিবর্ত্তন দ্বারা, ধর্ম্মসমাজ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব্ব করে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতিগত জীবনেও, প্রবল জাতির ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সমাজ, দুর্ব্বল জাতির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পায়। ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সমাজ সংক্রান্ত বিরোধে, এইজন্য, জাতিতে জাতিতে রক্তারক্তি সংগ্রাম বাধিয়াছে। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে, রাষ্ট্রের লোকদের ধর্ম্ম-সমাজে ধর্ম্ম-সমাজে মিল না থাকিলে, সে রাষ্ট্র অশান্তি-পূর্ণ ও হীন-শক্তি হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কয়েকটা কথা বলিলাম, তাহা বহির্ম্মুখীন ধর্ম্মের কথা। অন্তর্ম্মুখীন ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার বা ধর্ম্ম-সমাজ নিয়া তেমন ব্যস্ত নহে। মানবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নিকট হইতে নিকটতর করিবার জন্য, অন্তর্ম্মুখীন ধর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের পথ দিয়া, সাধনার দিকে মানুষকে আহ্বান করে। ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্র এই অন্তর্ম্মুখীন ধর্ম্মকে রাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে তেমন প্রয়াস পায় না। ধর্ম্ম যতক্ষণ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বারা মানবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নিকটতর করিতে চেষ্টা পায়,—কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সমাজ বা আচার ব্যবহার নিয়া তোলপাড় করে না,—ততক্ষণ রাষ্ট্র কোনও ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-সমাজকে পরাভূত করিতে তেমন যত্নবান হয় না। ইউরোপীয় ইতিহাসে, ধর্ম্মের নামে নর-শোণিতে ইউরোপ যে রঞ্জিত হইয়াছে, প্রায়ই তাহার মূলকারণ ধর্ম্ম সংক্রান্ত ছিল না, ছিল, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-সমাজ (church)-সংক্রান্ত। ভারতবর্ষের হিন্দু-ধর্ম্মের নামে রক্তপাত ততটা হয় নাই, কারণ, হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজে প্রবেশ করিতে হইলে, শুধু হিন্দু-ধর্ম্মের মত-গ্রহণ করিলেই হয় না, একপুরুষ হিন্দু আচার ব্যবহার মানিয়া চলিলেও হয় না। সে ধর্ম্ম-সমাজে প্রবেশের ব্যবস্থা, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান সমাজে প্রবেশের ব্যবস্থা হইতে ভিন্ন।

(৭)

আজ পর্য্যন্ত যত রাষ্ট্র দেখা গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকের মূলভিত্তি বল বা শক্তি (force)। যে সব লোক রাষ্ট্রপতির বা রাষ্ট্রীয় লোকের অমঙ্গল করে বা করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে শাসন করা হয়, শক্তির সাহায্যে। কোন্ ক্ষেত্রে কতটা বল প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা কে স্থির করিবে? কতটা অশুভ করিলে, রাষ্ট্র-শক্তি দ্বারা অশুভকারীর প্রাণনাশ করা হইবে, কতটা অশুভ করিলে অশুভকারীর শুধু

কিছুকালের জন্য স্বাধীনতা হরণ করা হইবে, না শুধু কিছু অর্থদণ্ড করা হইবে, তাহা কে স্থির করিবে ? এক সময়ে, দলপতি বা রাষ্ট্রপতি নিজে তাহা স্থির করিয়া দিতেন। রাষ্ট্রের বা দলের অপর লোক তাহা মানিত। ক্রমে, নায়ক পিতৃগণের পরামর্শে তাহা স্থির করা হইত। কিন্তু স্থির হইয়া গেলে, অশুভকারীর প্রাণনাশ বা স্বাধীনতা হানি বা অর্থ-ক্ষতি করা হইত, রাষ্ট্রপতির দোহাই দিয়া, রাষ্ট্রপতির নামে। রাষ্ট্রশক্তির পাছে অসংযত প্রয়োগ হয়,—পাছে রাষ্ট্রপতি বা তাহার অমাত্যবর্গ যথেচ্ছ ব্যবহারে লোকের প্রাণ, স্বাধীনতা বা অর্থের ক্ষতি করিয়া বসে,—তাহার প্রতিবিধান হইল, সেই রাষ্ট্রের নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারে বা আইনে। প্রথমে যাহা ছিল আচার (custom), তাহাই পরে হইল রাষ্ট্রপতির আইন (law)। ব্যবহার অনুযায়ী বিচার করিবার ভার হইল, বিচারপতির উপর। বিচারপতি বা আদালত যাহ বিচারে স্থির করিবে, তাহা রাষ্ট্রশক্তিদ্বারা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। বিচারকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, রাষ্ট্রশক্তি সাহায্য করিবে। প্রমাণ—পেয়াদা প্রয়োজন হইলে পুলিস তাহাতেও না কুলাইলে, সেনা আসিয়া বিচার ফল কার্য্যে পরিণত করাইবে, রাষ্ট্রপতির নামে।

রাষ্ট্রের বাহিরের শত্রুর কথাও বলিয়াছি। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য হরণ করিতে চায়, সম্পত্তি গ্রাস করিতে চায়। কোনও রাষ্ট্রপতি বা পৃথিবীর ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইবার ইচ্ছায়, বিজয়গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য, অপর রাষ্ট্রকে পরাভূত করিতে চায়। তখন, রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার উপায়, সেই রাষ্ট্রের শক্তি। আবার, এক রাষ্ট্রের পর-রাষ্ট্র দমনের উপায়ও, শক্তি। সেইজন্য বলিতেছিলাম, রাষ্ট্রের মূলভিত্তি, **শক্তি**।

আধ্যাত্মিক বলের গর্ব্ব করিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া, আমরা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি, রাষ্ট্রশক্তি পাশব-শক্তি (brute force)। কিন্তু, এই শক্তি শুধু জড়শক্তিও নহে, শুধু পাশব-শক্তিও নহে। জড়শক্তি, যেমন প্রবল বন্যা, ভীষণ ঝড়, বা বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের পিসটন্ লৌহদণ্ডের ভীষণ অগ্র-পশ্চাৎ গতি। বন্যার মুখে যে পড়িয়াছে, সে ভাসিয়া যাইবেই, বন্যা তাহাকে পাশ কাটাইয়া যাইবে না। ঝড়েরপথে প্রকাণ্ড বটগাছ থাকিলে, ঝড় তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বা সমূলে উপাটিত করিবার জন্য বুদ্ধি খেলাইবে না। চলন্ত এঞ্জিনের পিসটন্ লৌহদণ্ডের গায়ে অতর্কিতে যদি তোমার শরীরের কোন অংশ আসিয়া লাগিয়াছে, তোমার নিস্তার নাই। পাশব শক্তি প্রয়োগের বেলা কিছুটা বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। জঙ্গলে বাঘে হাতিতে যখন লড়াই হয়, বাঘ গিয়া হাতীর পায়ে কামড়ায় না, একেবারে সোজা ঘাড়ে চড়িয়া এমন যায়গায় কামড়ায়, যেন হাতি আর শুঁড় দিয়া বাঘকে ধরিতে না পারে।

মানুষ রাষ্ট্রের জন্য যে শক্তি সঞ্চিত করে, তাহা জড়-শক্তি, পাশব শক্তি ও তাহার উপরে আরও কিছু। মানুষ মানুষকে মারিবার জন্য, অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া, সেনাদিগকে বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা দেয়। অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া, বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, মানুষ একের পর অন্য বিনাশ-যন্ত্র আবিষ্কার করিতেছে। কেমন করিয়া বিনাশের-যন্ত্র ভীষণ হইতে ভীষণতর হইবে, কেমন করিয়া শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা সুনিশ্চিত হইবে, তাহার জন্য যুগ-ব্যাপী সাধনা

চলিয়াছে। যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পরে, রাষ্ট্রের বিনাশ-শক্তি কি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা ইউরোপীয় মহাসমরে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে। শুধু বিনাশক যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে, এমন নয়। সভ্যতার মূলমন্ত্র যে বহুজনের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের ব্যবস্থা (organisation), তাহাও সংহার সাধনায় প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংহার ব্যাপারে সহস্র সহস্র মানব নায়কের ইঙ্গিত মাত্রে, কেমন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সমবেত চেষ্টা করিবে, তাহা সেনাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দশজনে, একের পর একে, দশবার বল-প্রয়োগ করিলে যাহা বিনষ্ট হয় না, তাহা দশজনে একযোগে, এক মুহূর্ত্তে আক্রমণ করিয়া সহজে বিনাশ করিতে শিক্ষা পাইতেছে। সংহার ও আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য, গণিত, রসায়ণ শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি জড় বিজ্ঞানের যত শাখা প্রশাখা আছে, সবই মানুষ কাজে লাগাইতেছে। জড়ের শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। পশুকে বশ করিয়া, পাশবশক্তির সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। ফলে, সংহার-কার্য্যে রাষ্ট্র-শক্তি, পাশবশক্তি অপেক্ষা, সহস্রগুণে অধিক ক্ষমতাশালী হইয়াছে। হিংস্র পশুদল, মানুষকে, ভূমি ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারে, গিরিগুহায় বা জঙ্গলে পালাইয়াছে, তবেই সভ্যতার বিস্তার সম্ভব হইয়াছে।

সংহার শক্তি সঞ্চিত হইলে, মানুষ শুধু হিংস্র পশু নাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। মানুষ শত্রু-মানুষকে বধ করিতে আনন্দ পাইয়াছে। মানুষের শিকার প্রবৃত্তির প্রেরণায় রাষ্ট্রীয় সংহার শক্তি সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, পশু ও মানুষ উভয়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। শত্রু-রাষ্ট্রপতি ও তাহার প্রজাবৃন্দকে শিকার করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, এমন নয়। স্বীয় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সংহার-শক্তি, সময়ে সময়ে, কি ভীষণ পৈশাচিক লীলা দেখাইয়াছে। এই সংহার শক্তি থাকিবে, প্রয়োজনমত প্রযুক্ত হইবে ও সম্বরণ করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিবিৎগণ এক নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, সংহার-শক্তির নিয়ন্তা সমর বিভাগের (military) কর্ত্তা, শান্তি-বিভাগের (civil) কর্ত্তার আজ্ঞাধীন থাকিবেন। প্রাণ-বিনাশ যাহার প্রধান কার্য্য, সে প্রাণ-রক্ষকের আজ্ঞাধীন থাকিবে।

(৮)

বর্ব্বর মানুষ, বল বা শক্তি সহজেই বুঝিত ও মানিত। তখন ছিল, 'জোর যার মুল্লুক তার'। বর্ব্বর মানুষের সমাজের ও রাষ্ট্রের মূল কথা ছিল, বল বা শক্তি। আর, বিংশ শতাব্দীতে আজও মানুষের, সমাজের না হোক্, রাষ্ট্রের মূল কথা, শক্তি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শক্তির প্রতিপত্তির হ্রাস ও ব্যবহার বা আইনের প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বিবাদের মীমাংসা হইত, শক্তির সাহায্যে, সভ্য রাষ্ট্রে, ব্যবহার বা আইন তাহার মীমাংসা করিতেছে। আর ব্যবহার বা আইন যেন প্রজারা মানে, তাহার জন্য সেনা ও শক্তি পশ্চাতে রহিয়াছে। কিন্তু এ কথা যেন মনে থাকে যে, ব্যবহার বা আইন সভ্যতার শেষ সিদ্ধান্ত নয়। বল বা শক্তির প্রয়োগ কমিয়াছে। ব্যবহার বা আইন আসিয়া তাহার স্থানে বসিয়াছে। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট প্রচারিত প্রেম ও অহিংসাকে, ব্যবহার বা আইনের স্থানে বসাইবার জন্য নিয়তই চেষ্টা চলিতেছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু তাহার দৈনন্দিন জীবনে, আজও বল ও ব্যবহারকে সরাইয়া দিয়া, প্রেমের প্রতিষ্ঠায় সফল-প্রয়াস হয় নাই।

বাসনার নিবৃত্তি-সাধন যতদিন সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়ায় না, প্রেমের একচ্ছত্র রাজত্ব যতদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ততদিন পৃথক সম্পত্তি (private property) মানব সমাজে রাখিতে হইলে, বল বা শক্তি অপেক্ষা, ব্যবহার বা আইন শ্রেয়ঃ, ইহা মানিতে হইবে। রামের সম্পত্তি রামই ভোগ করিবে, শ্যাম তাহাতে লোভ করিয়া চুরি বা ডাকাতি করিতে পারিবে না, করিতে গেলে, ব্যবহার বা আইন আসিয়া, প্রয়োজন হইলে শক্তির সাহায্যে, তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। নিবারণ করিতে না পারিলে, শ্যামকে শাসন করিবে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকেও এই ব্যবহার মানিয়া চলিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির জন্য পৃথক আইন থাকিতে পারে, কিন্তু সেই পৃথক আইন রাষ্ট্রপতিকে মানিয়া চলিতেই হইবে— রাষ্ট্রপতি নিজের খেয়াল মত চলিতে পারিবেন না। এখানেও, শক্তির পরিবর্ত্তে আইন; অনিয়মে, রাজ্য নাহি রয়।

শুধু সম্পত্তি রক্ষার জন্য আইন নয়। সব চেয়ে বেশী মূল্যবান, মানুষের জীবন। এক প্রজা অপর প্রজার জীবন-নাশ করিতে পারিবে না। নিজের খেয়ালে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও কোনও অশুভ কারী প্রজার জীবন নাশ করিতে পারিবেন না। সমাজে যদি প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে, আইনের ব্যবস্থা অনুসারে সে দণ্ডবিধান করিতে হইবে, রাষ্ট্রপতির খেয়াল অনুসারে নয়।

শুধু প্রাণ হরণ ব্যাপারে আইনের ব্যবস্থা নয়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরের মূল্য বাড়িতে লাগিল। এক প্রজা, অপর প্রজাকে নির্যাতন করিতে পারিবে না, শরীরে আঘাত দিতে পারিবে না। পুরোহিতগণ বলিয়া দিলেন,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও প্রজার অঙ্গে যথেচ্ছা আঘাত করিতে পারিবেন না।

শুধু শরীর নয়। মানুষের স্বাধীন গতিবিধি মানুষ মূল্যবান্ মনে করিতে শিখিয়াছে। এক প্রজা, অপর প্রজাকে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোনও স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না, এমন কি রাজ প্রসাদেও নয়। স্ব ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে চলাফেরা, দৈহিক স্বাধীনতা, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য নিতান্ত দরকারী। গত কয়েক বৎসর, বাঙ্গালার কয়েক শত যুবককে যখন চলাফেরার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্তরীণ করা হইয়াছিল, তখন কেহবা উন্মাদ কেহবা সংজ্ঞাশূন্য অর্দ্ধমৃত হইয়াছিল, কেহবা স্বাধীনতা হারাইয়া, আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহার এক কারণ এই যে, যাহারা মানসিক বৃত্তির পরিচালনা করিয়া অভ্যস্ত, কেবলমাত্র উপযুক্ত বিশুদ্ধ আহার্য্য, পানীয়, আলোক, বাতাস ও পরিধেয় বস্ত্র পাইলেই তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে না। মনের স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক বৃত্তির পরিচালনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কর্ম্ম করিবার সুযোগেরও প্রয়োজন। তাহা না পাইলে, মন অসুস্থ হইয়া পড়ে, ও অসুস্থ মন নিয়া, দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়। আমার মনে আছে, একদিন এক উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথনে জানিলাম যে, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের এক ইংরাজ সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, অন্তরীণে আবদ্ধ ছেলেরা তাহাদের বাড়ীতে যতটা আরামে ও আয়াসে থাকিতে অভ্যস্ত ছিল, খাওয়া পরা ও থাকা সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক আরামে সরকার তাহাদিগকে রাখিয়াছেন, তবুও ছেলেদের অভিযোগ থামে না। উত্তরে আমি বলি যে, ঐ সেক্রেটারীকে চাঁদা তুলিয়া, মাসে ৪০০০৲ টাকা বেতন দিয়া, কলিকাতায় তেতালা

সুসজ্জিত প্রাসাদে একাকী রাখিয়া, বিজলি বাতি ও পাখার বন্দোবস্ত করিয়া, চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় যোগাইতে আমি রাজি আছি। আরামের সব আয়োজন থাকিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কবাব কবুল থাকিবে যে —(১) বাড়ীর বাগানের বাহিরে যাইতে পারিবেন না, (২) পৃথিবীতে ঐ বাগানের বাহিরে কি হইতেছে বা হইয়াছে তাহা বাহিরের কাহাকেও জানাইতে পারিবেন না, আর, (৩) আমার খুসী হয় ত, ৫ বৎসর পরে তার মুক্তি, তাহাও আমার মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে। সেক্রেটারী সাহেব কি এই সর্ত্তে ৪০০০৲ টাকার এই রকম চাকুরী নিতে রাজি আছেন? তখন সেই রাজ কর্ম্মচারী আমাকে বলিলেন যে, এ অবস্থায় পড়িলে সে পাগল হইয়া যাইত। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, কোনও প্রজা ত নয়ই, স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও নিজের খেয়ালে রাষ্ট্রে কাহারও স্বচ্ছন্দে গতিবিধি নিবারণ করিতে পারিবেন না। দৈহিক-স্বাধীনতা মানুষের এক প্রধান অধিকার। আর এক অধিকারের কথা বলিব—স্বাধীন চিন্তার অধিকার। স্বাধীন-চিন্তা ও তাহার সঙ্গতার জন্য বাক্যের স্বাধীনতা—এ বড় মূল্যবান্ অধিকার। প্রাচীন ভারতে, নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা সম্মানের সহিত রক্ষিত হইত। সে স্বাধীনতা ভোগের অধিকার সকলের ছিল না বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সীমা নির্দ্দেশের প্রয়োজন তখনও ছিল, আজও আছে। মানুষ স্বাধীন চিন্তাকে যেমন ভয় করে, মৃত্যু বা নির্য্যাতনকেও তেমন ভয় করে না। স্বাধীন-চিন্তা বিপ্লব আনিয়া সমাজকে ও রাষ্ট্রকে ওলট পালট্ করিয়া দেয়। সমাজ, শ্রেণী বিশেষের মান মর্য্যাদা মানিয়া লইয়া, অপর সকল শ্রেণীকে বলিতেছে, উহার নিকট নতশির হও। স্বাধীন-চিন্তা সাম্যবাদ প্রচার করিয়া বলিতেছে—মানুষ সব ভাই ভাই, এক মানুষ অপরের নিকট বংশ পরম্পরায় মাথা হেট করিবে কেন? রাষ্ট্র বলিতেছে, কৃষক শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া রাষ্ট্রপতির ও তাহার পার্শ্বচর ধনী পদস্থ লোকের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া, অতীত বহুশতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানের সমাদর করিয়াছে, আজও তাহাই করা উচিত। স্বাধীন-চিন্তা প্রচার করিতেছে, সকল মানুষকে শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইবে, যথাসম্ভব, সমান করিয়া পারিশ্রমিক বাটিয়া নিতে হইবে, সমাজ ও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যত টুকু বৈষম্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, মাত্র ততটুকু বৈষম্য মানা যাইবে। স্বাধীন-চিন্তা মৃত্যুর পর-পারে স্বর্গের অস্তিত্ব আছে কিনা জানিতে চায়, নরকের বিভীষিকারও বিচার নির্ভীকভাবে করিতে চায়। মানবের মহত্ত্ব পরিচায়ক, এই স্বাধীন-চিন্তা। সে গণ্ডী মানে না, দল মানে না, সমাজ মানে না, রাষ্ট্রও মানে না, আর মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পর, তাহার প্রতিপত্তি ও শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং, রাষ্ট্র আত্ম-রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সীমা অতিক্রম করিলেই, রাষ্ট্র তাহার শক্তির সাহায্য লইয়া, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতাকে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতরে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। এখানেও সভ্য-রাষ্ট্র, শক্তির পরিবর্ত্তে, আইনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

শক্তির শাসনের (reign of force) পরিবর্ত্তে এই যে আইনের শাসন (reign of law) সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রত্যেকের স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে পরিস্ফুট বোধ থাকা চাই। আর, পরের অধিকারের সম্মান করিতে

নিজে ষোল আনা বাজি হওয়া চাই। শুধু নিজের অধিকার (right) বজায় চলিবে না। নিজের দায়িত্ব (duty) বোধ সমান পরিস্ফুট হওয়া নিতান্ত দরকার। নতুবা, শুধু আইনের শাসনে, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

(৩)

এই যে ব্যবহার বা আইনের কথা, প্রজার অধিকারের কথা বলিতেছিলাম, এ অধিকার কে নির্দেশ করিয়া দিবে? ব্যবস্থাপক কে? অতি প্রাচীন কালে, কোনও কোনও দেশে, পুরোহিত ছিলেন, রাষ্ট্রপতি। কিম্বদন্তি হইতে জানা যায় যে, সেই পুরোহিত রাষ্ট্রপতি, ব্যবহার বা আইন নির্ণয় করিয়া তাহা প্রচলিত করিয়াছিলেন। সবদেশে একরূপ হয় নাই। অনেক স্থলে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদের সুবিধা ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের সুবিধা, ও সমগ্র সমাজের ধর্ম্ম ও ন্যায় বোধ ও সমাজ ও রাষ্ট্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, এই সকলের কিছুটা সামঞ্জস্য রাখিয়া, অলক্ষিতে সদাচার (custom) গড়িয়া উঠিত। সেই সদাচার, রাষ্ট্রপতির নামে, সকলকে মানিতে হইত। তাহাই হইল, ব্যবহার বা আইন। রাষ্ট্রপতি ও পিতৃনায়কগণ বা পুরোহিতগণ, একযোগে ক্রমশঃ সময় ও সুবিধা বুঝিয়া, সেই সদাচারের কালোপযোগী পরিবর্ত্তন করিত ও সমাজ তাহা মানিত। রাষ্ট্র যখন ছোট ছিল, পিতৃনায়ক বা পুরোহিতের সংখ্যা যখন বেশী ছিল না, তখন সকলে একত্র হইয়া, পরামর্শ করিয়া ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব-পর ছিল। এ পরিবর্ত্তনে, নিম্নশ্রেণীর বা স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাৎভাবে পরামর্শ দিবার সুযোগ বড় একটা ছিল না। পরিবর্ত্তিত ব্যবহার, তাহাদের পক্ষে দুঃসহ না হইলেই, তাহারা তাহা মানিয়া চলিত। কিন্তু, রাষ্ট্রের পরিসর বৃদ্ধি হইলে, সকল পিতৃ-নায়ক বা পুরোহিতের একত্র হইয়া পরামর্শ করা সহজ হইত না। তখন, হয় যশস্বী খ্যাতনামা কোন ব্যবহার-বিৎ নূতন পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিতেন, সমাজ ক্রমে ক্রমে তাহা গ্রহণ করিত, নতুবা, বহুসংখ্যক পিতৃনায়ক বা পুরোহিত, অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া দিত। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ একত্র পরামর্শ করিয়া, নূতন পরিবর্ত্তনের বিধান করিত। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন বা ব্যবহার পরিবর্ত্তন ব্যাপারে সর্ব্ব সাধারণের প্রত্যক্ষভাবে হাত দিবার অধিকার ছিল না।

ব্যবহার বা আইন স্থিরীকৃত হইলেই, সকলে তাহা মানিয়া চলিবে, এরূপ আশা করিবার সময় আজ পর্য্যন্ত মানবের ইতিহাসে আসে নাই। এক গ্রামের এক খণ্ড জমি যখন রাম ও শ্যাম উভয়ে দাবী করে, তখন তাহাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য, আইনের ব্যাখ্যা করিয়া, রাম বা শ্যামের অধিকার নির্ণয় করিবে কে? এ কাজ ব্যবস্থাপকের নয়, ইহা বিচারকের কাজ। রাষ্ট্রপতি একেলা সকল বিরোধের মীমাংসা করিবার অবসর পান না। এত প্রজার, এত বিরোধ, একজন মীমাংসা করিতে পারে না। এবার আসিল, বিচারকের দল। বিচারক ও বিচারালয়, শুধু রাজধানীতে থাকিলে চলিবে না। সকল প্রজা রাজধানীতে বা বড় নগরে বাস করে না। সকল প্রজা যদি ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অবতার না হয়, ও সেই জন্য প্রজার অধিকার রক্ষা করা যদি রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য হয়, তবে প্রজার অধিকার রক্ষা করিতে, বিচারালয় প্রজার

বাসভূমির অনতিদূরে স্থাপিত করিতে হইবে। ন্যায়-বিচারের জন্য, প্রজাকে সাতদিনের পথ রাজধানীতে যাইতে হইবে না। ন্যায়বিচার প্রজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

মনে কর, রাষ্ট্রপতি তাহার এক অমাত্যের উপর নারাজ। রাষ্ট্রপতির এক অনুগত অনুচর অভিযোগ আনিল যে, ঐ অমাত্য এক দরিদ্র দুর্ব্বল প্রজার প্রাণনাশ করিয়াছে। অভিযুক্ত অমাত্য বলিল, উহা মিথ্যা অভিযোগ,—রাষ্ট্রপতির মন যোগাইতে, মিথ্যাবাদী অনুচর ষড়যন্ত্র করিয়া, অমাত্যের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টায়, এই অভিযোগ আনিয়াছে। ইহার সত্যাসত্য কে নির্ণয় করিবে? বিনা বিচারে রাষ্ট্রপতি সেই অমাত্যের প্রাণদণ্ড বিধান করিলে, সমাজের নিন্দাভাজন হইবেন। অমাত্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া, তাহাকে চির-জীবন অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলেও হয়ত রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অমাত্য বলিল, সে নির্দ্দোষী, সে ন্যায়-বিচার চায়। ব্যবহার আইন বলিয়া দিয়াছে ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার, সকলের আছে। বিচার কে করিবে? এমন বিচারক চাই যে রাষ্ট্রপতিরও গুপ্ত আদেশ মানিবে না। রাষ্ট্রপতির অনুরাগ বা বিরাগ উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদেশ মানিবে। বিচারক মানুষ, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, আবার, লোভ আছে, ভয়ও আছে। সুতরাং, রাষ্ট্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বিচারকের নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদচ্যুতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির খেয়াল খাটিবে না। রাষ্ট্রপতির খেয়ালকে এমন আইনের বাঁধনে বাঁধিতে হইবে যে, বিচারক, আইন মানিয়া, বিচারকার্য্য স্বীয় ধর্ম্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে, ও রাষ্ট্রপতির গুপ্ত-ইচ্ছার খাতির না করিলেও, বিচারকের কোনও আর্থিক ক্ষতি হইবে না। এক কথায়, বিচারকের ধর্ম্মপথে থাকা সহজ করিয়া দিতে হইবে।

ধনী দরিদ্রে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, উচ্চ-পদস্থ লোকে ও সহায়-সম্পদহীন লোকে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন যেন দরিদ্রতম নগণ্য প্রজার মনে বিশ্বাস থাকে যে, সে ন্যায়ের ও ধর্ম্মের রাজত্বে বাস করিতেছে। চাই এমন আইন, এমন বিচার-পদ্ধতি, এমন বিচারক যে, ন্যায় ও সাম্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শক্তির অত্যাচার দূর হইলেই হইল না। আইনের অত্যাচার দূর করিতে হইবে। ধনী ধনের সাহায্যে, আইন বাঁচাইয়া, দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। মোকদ্দমা করিয়া, দরিদ্রকে জেরবার করিতে পারিবে না। তবে ত সুরাষ্ট্র।

আবার যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি বিদেশীয় ভিন্ন জাতির লোক, সেখানে আবার এক নূতন কারণে বৈষম্যের আবির্ভাব হয়। সেখানে রাষ্ট্রপতির স্বজাতিগণ অনেক ব্যাপারেই সে দেশের ধনী বা পদস্থ অধিবাসীদিগের অপেক্ষাও উচ্চ অধিকার পাইবার প্রত্যাশা করে। তাহার ফলে, সে রাষ্ট্রে, হয়তবা স্বদেশীর জন্য এক আইন, আর রাষ্ট্রপতির বিদেশীয় স্বজাতিবর্গের জন্য ভিন্ন আইন হয়। আর যদিই বা উভয়ের জন্য একই আইন হইল,—মনে কর আইনে বৈষম্য নাই,—রাষ্ট্রপতির স্বজাতি বিদেশী বণিকে ও সে দেশের স্বদেশী বণিকে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মীমাংসা করিবে, বিচারক। ভয়েই হোক্, প্রলোভনেই হোক্, রাষ্ট্রপতির বা তাহার স্বজাতি

বর্গের নিকট সুনাম পাইবার প্রত্যাশায়ই হোক্, বিচারক রাষ্ট্রপতির স্বজাতির দিক চাহিয়া বিচার করিয়া বসিবে। এই ব্যাধির প্রতীকার সবচেয়ে কঠিন। স্বদেশীর জন্য এক আইন ও বিদেশী রাষ্ট্রপতির স্বজাতিবর্গের জন্য অপর আইন, ইহার প্রতিকার বরং সহজ। কিন্তু, আইনে যখন বৈষম্য নাই, তখন বিচারককে ধর্ম্মের পথে রাখিবার একমাত্র উপায়, বিচারকের দৃঢ় চরিত্র, ধর্ম্ম জ্ঞান ও ন্যায় বোধ। বিচারকের চরিত্রে ধর্ম্মজ্ঞান ও ন্যায় বোধের অভাব হইলে, আর বিচারকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও আইন জ্ঞান প্রখর হইলে, বিচারক যে বৈষম্যের অবতারণা করিতে পারেন, তাহার প্রতিকার আইনের সাধ্যাতীত।

আবার বলিতেছি, বল বা শক্তির মীমাংসা অপেক্ষা, ব্যবহার বা আইনের মীমাংসা ভাল। কিন্তু, ব্যবহার বা আইন, সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ বা শেষ বিধান নয়। আর, মানব-সমাজ হইতে যতদিন বল বা শক্তির অপব্যবহার দূর না হইবে, ততদিন দুর্ব্বলকে শক্তি সাধনা করিয়া, সবল হইবার চেষ্টাও করিতে হইবে। কথায় কথায়, ছোট ব্যাপারে, আইন আদালতের আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়; সবল যাহাতে শক্তির অপব্যবহার করিতে সাহস না পায়, সেই জন্য শক্তি-সাধনার প্রয়োজন আছে। নিজের অধিকার বুঝিতে হইবে। পরের অধিকারের সম্মান করিতে হইবে। শক্তি সাধনা একেবারে বাদ দিলে চলিবে না।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

চিন্তা ও কাজ।

মানুষ মাত্রেই কিছু না কিছু চিন্তা করে। তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার ধারা প্রবাহিত। সং ও অসং নানারকম চিন্তার মধ্যে, আদর্শের একটা চিন্তা যে আমাদের মনের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। এই আদর্শের কথা কেহ বা বেশী ভাবেন, কেহ বা আর দশটা আবর্জ্জনার স্তূপের নীচে সেটা চাপা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। যিনি অধিক পরিমাণে ভাবেন, অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, তিনি কেবল চিন্তা করিয়াই নীরব থাকিতে পারেন না, তিনি সেটাকে কথায় প্রকাশ করেন ও কাজে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। অনেকে আবার এমন আছেন, যাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীটির মত কত মহৎ চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু হয় ত ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁর নাই, কিংবা ভাষা থাকিলেও, উদ্যম নাই, অথবা সমাজ-আবেষ্টনের একটা বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িয়া, আত্ম-প্রকাশের সুযোগ নাই। আমি এই কথাটি বলিতে চাই যে, সাংসারিক ও সামাজিক হিসাবের ছোট বড় বিচার না রাখিয়া, যেখানে যা ভাল চিন্তা লাভ করিব, তাহাকে বিকশিত করিবার অবকাশ ও সুযোগ যেন আমরা দিতে পারি; আর ভাবের রাজ্যেই যেন চিন্তার পরিসমাপ্তি না ঘটে,—যেন মহৎ চিন্তার গতির সহিত কাজের গতির মিলন হয়, এইটাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

একথা নির্ভুল যে দুঃখীর দুঃখে আমাদের প্রাণ কাঁদে, অধঃপতিতকে তুলিয়া ধরিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, দেশের ও দশের কল্যাণে আপনাকে নিয়োগ করিতেও সাধ যায়। এত ইচ্ছা সত্ত্বেও করি না কেন, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার প্রধান উত্তর এই যে, সাধারণতঃ উপরের ভাসা ভাসা তরল ভাবুকতার উপর তরঙ্গ তুলিয়া, এই চিন্তাগুলি বুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া যায়। জীবনের ভিত্তি শুদ্ধ প্রবলভাবে নাড়া দেয় না বলিয়াই, কাজ করিবার ব্যাকুল ইচ্ছা জাগ্রত হয় না। মহাপুরুষদের সহিত আমাদের প্রভেদ, এই খানে। আমরা যেখানে জরা মৃত্যু শোক বিচ্ছেদ দর্শনে দু'ফোঁটা অশ্রু ফেলিয়া, তারপর সব ভুলিয়া যাই—ঠিক সেই জায়গায়, বুদ্ধের মত মহাপুরুষ শুধু একটু করুণ অনুভূতির রাজ্যে বিরাজ করেন না। সমগ্র জীবন দ্বারা দুঃখীর অশ্রু মুছাইবার উপায় করেন। অনেকে তর্কের খাতিরে হয়ত বলিবেন, সকলের যখন বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়, তখন আর সাধারণ লোকের অক্ষমতাকে দোষ দেওয়া কেন? তার উত্তরে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, আমরা সকলে মহাপুরুষ না হইতে পারি, কিন্তু, প্রত্যেকেই কি মানুষ নই? শক্তি হয় ত কম বেশী আছে কিন্তু শক্তিরূপে ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত আছেন, এ আমি বিশ্বাস করি। অনেকে আত্ম অবিশ্বাসে শান্ত হইয়া, নিজেকে ছোট মনে করেন, সে অবিশ্বাস তাঁহাদের ভাঙ্গিতে হইবে। তবেই তাঁহাদের কাজের শক্তি বিকাশ লাভ করিবে। চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রধান শত্রু—আত্ম অবিশ্বাস, অপ্রেম ও লোকমতের ভীতি।

আত্ম অবিশ্বাস প্রত্যেকে যদি নিজেরা না দূর করিতে পারি, তবে অন্য দশজন বন্ধুর উচিত নয় কি, তাহার ভ্রান্তিদূর করিতে চেষ্টা করা? যখন তাঁহারা সে প্রয়াস করেন না, তখনই প্রেমের অভাব উপলব্ধি করি। তখনই বুঝি, অপ্রেম সহানুভূতিকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। কাজের কথা বলিলেই, লোকের নীরসতার কথা হয়ত মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সব কাজ কি নীরস? হৃদয়ের যোগ শূন্য কাজ ত বিফল ও নীরস হইবেই। হৃদয়ের প্রেমই সব কাজে সরসতা আনে। এখন দেখি, সত্যই আমাদের মধ্যে প্রেমের অভাব আছে কি না। সম-ব্যথী যে সব সময় জুটে না, তার মূল কারণ সংসারের হৃদয়হীনতা এই আমরা কল্পনা করিয়া লই, কিন্তু আমার মনে হয় যে, অতি সভ্য সমাজের কৃত্রিম বন্ধন ও অবস্থার প্রতিকূলতাই সহানুভূতির আসল প্রতিবন্ধক। একজন হয়ত আর একজনের সব ব্যথার ব্যথী হইতে পারিত, কিন্তু অবস্থার চক্রে, তাহারা এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন যে, তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। অধিকাংশ সময় হয় কি, নিজের ব্যথা আমরা গোপন রাখি, প্রকাশ করিলে হয়ত, সমবেদনার পরিবর্ত্তে উপহাস পাইবার সম্ভাবনাই অধিক ভাবিয়া নীরব থাকি। এ অবস্থায় ঠিক দরদীর কাছেও মনটি খোলা হয় না। আবার অন্যদিকে এমনও হয়—আর একজনের দুঃখবেদনা সব মনে মনে উপলব্ধি করিয়া প্রাণ সমবেদনায় পূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাকে জানাইতে পারিলাম না, "আমি তোমার ব্যথার ব্যথী"। সেখানেও সঙ্কোচ—সে আমার সমবেদনা চায় কি না,—এই ভাবিয়া। নিতান্ত আপনার লোকের কাছেও যে বেশি সময় নিজেকে আমরা গোপন করি, তাহা আবার তুচ্ছ অভিমান লইয়াই হয়ত করি। এমনই করিয়া বাধার পর বাধা সৃষ্ট হইয়া, একটা মনকে আর একটা মন হইতে আড়াল করিয়া ফেলে। যেরূপেই হউক, বাহির হইতে দেখিলে, অপ্রেমই চোখে

পড়ে সেটা সত্যই হউক, আর কাল্পনিকই হউক। কাল্পনিক যদি হয়,—সত্যই যদি আমাদের প্রাণে প্রেম থাকে—তবে এস আমরা প্রেম-ব্রত গ্রহণ করি। আপনাকে আর লুকাইয়া রাখিব না। যাহারা নিজের প্রতি অবিশ্বাসে টল্‌মল্‌, তাহাদের নিকটে গিয়া প্রেম দিয়া, তাহাদের সুপ্ত-শক্তিকে জাগ্রত করিব।

লোক-মতকে ভয় করিয়া চলার জন্যও অনেকের কাজে অপণ থাকিয়া যায়, বিশেষভাবে নারীজাতির। কবি যে বলিয়াছেন—

করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

এ কথাটা মেয়েদের পক্ষে বড় বেশী খাটে। কত চিন্তাশীলা রমণী ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছেন। চিন্তাকে ব্যক্ত করিবার সাহস তাহাদের নাই। কত কর্মশীলা নারী লোক লজ্জার বাঁধনে কল্যাণ-পটু হাত দুই খানি বাঁধিয়া মঙ্গলকার্য্য হইতে বিরত আছেন, তার খবর কি কেহ রাখেন? 'পাছে লোকে কিছু বলে', এই ভয় আমাদের কত সর্ব্বনাশই করিতেছে। ইহাকেও দমন করিতে হইবে, শুধু প্রেমে। কাজের মধ্যের ভুলচুক-গুলি আমরা সহানুভূতির চক্ষেই দেখিব জানিলে, প্রত্যেক কর্ম্মী প্রাণে উৎসাহ ও আশ্বাস পাইবেন। যুগে যুগে ভগবান মানুষের ভিতরেই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতিক্ষুদ্র মানুষের দ্বারা অতিবৃহৎ কাজের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সম্ভব, তুমি আমি মহাপুরুষ নহি, সে শক্তি আমাদের নাই, কিন্তু যতক্ষণ মানুষ বলিয়া মনুষ্যত্বের দাবী করিতেছি, ততক্ষণ কোন কাজই কি আমরা পারি না? হউক ক্ষুদ্র, হউক সামান্য, তাহারি সমষ্টিতে বৃহতের প্রতিষ্ঠা হইবে। এক আমার চেষ্টায় ও শক্তিতে সব রকম ভাল কাজ না হইতে পারে, কিন্তু দশজনের সম্মিলনে কত কাজই না হয়। একাই সবটুকু করিয়া খ্যাতিলাভ না-ই করিলাম। দশজনে ভালবাসায় এক হইয়া একটি কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছি, ইহাতে কি আনন্দ নাই? বিশ্ব-সেবার মন্দির একা কে গড়িতে পারে? অনেকের হাতের স্পর্শেই সে শোভন-সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

এই কর্ম্মময় যুগের স্পন্দন আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে, চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে, প্রাণ সাড়া দিয়াছে। তবে আর নীরব থাকি কেন? ভগবান ত সকলেরই প্রাণে জাগ্রত, তবে কেহ তাঁর ডাক শুনিতেছে, আর কেহ বা বধির। যে সাহসী, সে সত্য যাহা বুঝিয়াছে তাহা প্রাণপণে সাধন করিবেই, তাহারই মস্তকে তিনি জয়মাল্য পরাইয়া দিবেন। লোকের বিদ্রূপের মূল্য কি? আজ পর্য্যন্ত মহৎ কার্য্যে সৎসাহসে বুক বাঁধিয়া যে কেহ অগ্রণী হইয়াছে, কূপ-মণ্ডুক মানুষ কি তাহাকেই অভিশাপ দেয় নাই? তবু সে সম্মুখে ছুটিয়া গিয়াছে, প্রাণের অদম্য বেগে। তাহার প্রাণের একটা গতি আছে বলিয়াই, কেহ তাহার পথ-রোধ করিতে পারে নাই। আমাদের চিন্তার ও কাজের মূল্যের তখনই যাচাই হইবে, যখন দেখিব আমাদের গতিরোধ করিতে সবই

অসমর্থ, সত্যই আমরা "ছুটেছি উন্নতি পথে আনন্দে বিহ্বল।" আপনাকে যেদিন বিশ্বাস করিব, সকলকে যখন প্রেমে হৃদয়ে টানিয়া লইব, আর লোকনিন্দার ভয়ে যখন অসত্যের আশ্রয় খুঁজিব না, সে দিন আমাদের সব কাজ সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। আশা, বিশ্বাস, উদ্যম লইয়া চল, অগ্রসর হই। উৎপীড়িত, অভিশপ্ত ভাই-বোনদের নূতন বার্ত্তা শুনাইয়া, বলি—"তোমরা এমন ভাবে আর ধূলায় লুটাইও না, যে যেখানে আছ, নিজের আত্মাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। মনকে মুক্তি দাও। মিথ্যার বাঁধন কাটো। যাহা চিন্তায় স্থান পাইয়াছে, তাহাকে কার্য্যে পরিণত কর।

এই রূপে আমরা চিন্তা ও কাজের ধারা মিলাইয়া লইবার শক্তি লাভ করিলে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ হইবে না।

আঁধারের যবনিকা ছিন্ন করে দিয়ে
চাইব আমি সত্য-সূর্য্য পানে
সেই হবে মোর সকল প্রাণের চাওয়া।
দুঃখ-শোক বাধা-ভয়-জয়ী প্রাণ নিয়ে
গাইব আমি আনন্দের গান,—
সেই ত আমার মুক্ত-কণ্ঠে গাওয়া।

শ্রীসুনীতি দেবী।

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী।

আট বছরের মেয়ে,
খেলতেছিল বাগ্নাবাড়া
ধূলোমাটি নিয়ে।

যা' কিছু তা'র আছে জানা—
একটা ছোট বিড়াল ছানা,
ঝাঁপির পুতুলগুলি,
এসব নিয়ে আনন্দেতে
দিন যেতেছে চলি'।

ভেঙ্গে তা'র সে সোণার খেলা
পরাণ ভরা সুখের মেলা,
খাঁচায় পূরে', হায়!
স্বভাব-সুরে গাইত পাখী
পড়াতে চাও তায়!

আজকে খুকী নয়, খুকী যে
দশ জনার-ই এক জনা সে,
আজকে সে যে বউ,
ছেলেমেয়ের দলেতে আর
নয়কো ত সে কেউ।

সে আজ বড় গভীর জ্ঞানী,
সব-জান্তা গুণের খনি—
বুঝা চাই তার সব,
তা' না হলে গ্রামটা সুদ্ধ
কতই কলরব!

শিশুরা খায়, রয় সে চেয়ে,
শেষটা তাদের দিয়ে থুয়ে,

থাকলে তবে পায়,
যদিও হয় তাদের ছোট
সে যে গো বউ, হায়।

দুঃখ থাকে বক্ষে করে',
আনন্দে না হাস্‌তে পাবে,
দোষের অভাব নাই,
পানটি থেকে চূণটি গেলে
মুখ ভরে দেয় ছাই।

ওগো,
দিয়েছ তা'র পাখা কেটে
থাকতে হবে হাত পা গুটে'।

পাষাণ দেছ বুকে
এমনি সুখের, শৈশবের
প্রাণ কাঁদেনা দুঃখে।

আট বছরের মেয়ে
খেলতে ছিল বাগ্নাখাড়া
ধূলোমাটি নিয়ে।
স্বামীর চেয়ে পুতুল যাহার
অধিকতর কাছে,
তারই নাকি বিয়ে দিয়ে
পূণ্য বেশী আছে।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্-শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ।

স্কুল ও কলেজ পরিত্যাগ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে ছাত্রবর্গের প্রতি আমার বক্তব্য, গত প্রবন্ধগুলিতে বলিয়াছি। কিন্তু এই সম্পর্কে, ছাত্র বর্গের যাহারা অভিভাবক, তাহাদের নিকটেও আমি কয়েকটী বক্তব্য নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আশা আছে যে, তাহারা আমার এই সসম্মান নিবেদনটী উপেক্ষা করিবেন না।

বিগত ১৯১৭ সালের শেষভাগে 'পোষ্ট-গ্রাজুয়েট' বিভাগটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। অতি অল্পদিন হইল এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির ভার বিশ্ববিদ্যালয় আপন হস্তে লইয়াছেন। পূর্ব্বে যে প্রণালীতে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত, এই নূতন প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি যে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, উভয় প্রণালীর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—এই বিষয়টী এখন পর্য্যন্ত দেশের লোক তেমন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই, বিগত বর্ষে এই কলিকাতা নগরীতে প্রকাশ্য সভা করিয়া, এই "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" বিভাগের বিরুদ্ধে, নানারূপ নিন্দা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। কোন কোন দেশীয় সংবাদ পত্রেও অনেক নিন্দা রটিত হইয়াছিল। ইহার কারণ কি? এই নিন্দা-উদ্‌ঘোষণের প্রধান কারণ—এতৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। যদি দেশের লোকে, প্রকৃত অনুসন্ধিৎসার সহিত, এই নূতন-প্রবর্ত্তিত বিভাগে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এবং কি কি বিষয়ে কিরূপে শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতেন এবং ভাল করিয়া দেখিবার কষ্ট গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই ঐ প্রকার নিন্দা ঘোষিত হইতে পারিত না। কেন হইতে পারিত না, তাহা বলিতেছি।

ছাত্রবর্গের যাহারা অভিভাবক, তাঁহাদিগকে, আমাদের দেশে, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতে পারা যায়। যাহারা ইংরাজী-শিক্ষিত, সেই প্রকার অভিভাবক এক শ্রেণীর, যাহারা দেশের প্রাচীন-কল্প লোক আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, তাঁহারা এক শ্রেণীর অভিভাবক। ইংরাজী-শিক্ষিত অভিভাবকগণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। যাহারা ইংরাজীশিক্ষার সঙ্গে তাদৃশ সম্পর্কে আইসেন নাই, এই প্রকার অভিভাবকগণের সংখ্যাই দেশব্যাপী। ইহাদের সন্তানেরাই স্কুল কলেজে অধিক সংখ্যক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের ঔদাসীন্য বিশ্ববিখ্যাত। এই ঔদাসীন্যের ফলে, যে সকল অভিভাবক ইংরাজী-শিক্ষিত তাহারাও, এই নূতন প্রবর্ত্তিত পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে কি প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই প্রণালীটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এইটুকুমাত্রই তাহারা জানিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব ছাত্রগণের মুখেও মোটামুটিভাবে কেবলমাত্র একটা পরিবর্ত্তনের সমাচার শুনিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিশেষ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ-পত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য, তাদৃশ যত্ন লয়েন নাই। আর যে সকল অভিভাবক প্রাচীন কল্পের, তাঁহারা ত কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষ তথ্যই জানিতেন না। আমরা এই প্রকারেই প্রায় সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকি। দেশে একটা কোন নূতন বিষয় প্রবর্ত্তিত হইলে, তদ্বিষয়ে প্রায়ই আমরা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করি না। এই আলস্য আমাদের মধ্যে একরূপ মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েরও দোষ আছে। "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে যে সকল বার্ষিক রিপোর্ট বা বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, সে গুলি সমস্তই ইংরাজীতে লিখিত হয়। স্যার্ আশুতোষ, এই বিভাগের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে সেনেট-সভায় যে সকল বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন, তাহাও ইংরাজীভাষায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেশের অধিকাংশ লোকই ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। সুতরাং, এই নূতন শিক্ষাপ্রণালীতে কি কি পরিবর্ত্তন করা হইল কি প্রকার নূতন ব্যবস্থাই বা অবলম্বিত হইল, বাঙ্গলা-দেশের জন-সাধারণ তাহা আদৌ জানিতে পারিলেন না। যাহারা ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহারাও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ঐ সকল রিপোর্টের পুস্তক পড়িয়া দেখিবার কষ্ট-স্বীকার করিলেন না। তারপর, কয়জনের নিকটেই বা ঐ সকল পুস্তক প্রেরিত হইয়া থাকে? ঐ সকল রিপোর্টের প্রচার নিতান্ত সঙ্কীর্ণস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্তই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের পরিবর্ত্তনগুলি এবং নূতন-প্রবর্ত্তিত কার্য্য-পদ্ধতির কোন সংবাদ, বাঙ্গলাদেশের মধ্যে তাদৃশ প্রচারলাভ করিতে পারিল না। কেবলমাত্র দুই-চারিটা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা লোক-মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রথম হইতেই, "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট"-বিভাগের কার্য্য-প্রণালীর বিবরণ ইংরেজীভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, বাঙ্গলা-ভাষায় বিস্তৃত-ভাবে ঐ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন এবং বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র ঐ বিবরণ-গুলি প্রচার করিয়া দিতেন, তাহা হইলে দেশের সকলেই বুঝিতে পারিত যে, তাহাদের

সন্তান-সন্ততির উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত কি চমৎকার প্রণালী প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। নিন্দা ত দূরের কথা, তখন দেশের লোক সহস্র কণ্ঠে এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রসংশা করিত, আমাদের মনে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নূতন একটা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইলেই, প্রথম প্রথম উহার কার্য্যপ্রণালীর বহুল-প্রচার নিতান্তই আবশ্যক। নতুবা, উহার সকল কথা প্রকাশিত হইতে অনেক কাল বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

আমাদের দেশের ছাত্রবর্গ "জাতীয় শিক্ষা" লইবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছে, সেইজন্য আমি এই প্রবন্ধে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" শিক্ষা পদ্ধতিতে, সংস্কৃত-বিভাগে, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক বিভাগে ও আর দুই একটী বিভাগে, কি কি নূতন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কেবল তৎ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। মাসিক-পত্রিকায় এ প্রকার প্রবন্ধে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট পদ্ধতির সকল বিভাগের অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নহে।

একটী-ছাত্রকে সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় উপাধি লইতে হইলে, কি কি বিষয়ে কি প্রকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় এবং এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইবার পূর্ব্বেই বা কি করিতে হইত, পাঠক সেইটা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে একটা বিপুল সাহিত্য বুঝায়। ইহার মধ্যে, নানাপ্রকার বিভাগে বিভক্ত নানা শ্রেণীর শিক্ষনীয় বিষয় আছে। একটা বিভাগ বাদ দিলেই ইহা অসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" শিক্ষা-পদ্ধতি, অতীব সাবধানতার সহিত, এই সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভাগগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোন প্রয়োজনীয় বিভাগই উপেক্ষিত হয় নাই। অথচ, পরীক্ষার্থী ছাত্রকে বিভাগের গুরুতর চাপেও নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিবার কোন চেষ্টা করাও হয় নাই।

সংস্কৃতে এম্-এ পরীক্ষার্থীকে আটটী পৃথক পৃথক্ প্রশ্ন-পত্রের উত্তর দিতে হইবে। এই আটটা প্রশ্ন-পত্রের মধ্যে চারিটী প্রশ্ন-পত্র সকল পরীক্ষার্থীর পক্ষেই সমান। কিন্তু অপর চারিটী প্রশ্ন-পত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ রচিত করা হইয়াছে। যে বিশেষ বিষয়ে ছাত্র, 'বিশেষ অভিজ্ঞতা' লাভ করিতে ইচ্ছুক, কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের জন্যই, এই চারিটী প্রশ্ন-পত্র নির্দ্দেশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা পরিষ্কার করিতেছি। যে চারিটী প্রশ্ন-পত্র সকল ছাত্রকেই লইতে হইবে, সেই চারিটী প্রশ্নপত্রের মধ্যে—

প্রথম প্রশ্ন-পত্র।—সায়নের টীকাসহ ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক এবং সায়ন-লিখিত ঋগ্বেদের ভূমিকাটী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন-পত্র।—সমগ্র পাণিনীয় সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ব্যাকরণ।

তৃতীয় প্রশ্ন-পত্র।—ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology)। আর্য্য ও প্রাকৃত ভাষার ক্রম বিকাশ-তত্ত্ব।—এই বিষয়টীতে সাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য প্রায় দশখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অনুমোদিত আছে। তন্মধ্যে "শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা" ও Whitney-সংকলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

চতুর্থ প্রশ্ন-পত্র।—দুইটা রচনা-লিখন। প্রথমটী "সংস্কৃত-সাহিত্যের" ইতিহাস সম্বন্ধে। দ্বিতীয়টী, যে ছাত্র যে বিশেষ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া অপর চারিখানি প্রশ্নপত্র লইবে, সেই বিশেষ বিষয়টীর ইতিহাস সম্বন্ধে।

সংস্কৃত বিদ্যার্থী মাত্রেরই ব্যাকারণাদি এই চারিটী বিষয়ে সাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকা নিতান্তই আবশ্যক। এই সাধারণ বিষয়ে, ভাষা ও ভাষার ব্যাকরণ এবং ভাষার ইতিহাস—এই হইতেছে

শিক্ষনীয় বিষয়। এই বিষয়ে সকলেই পরিপক্কতা লাভ করিতেই হইবে। তৎপরে যে ছাত্র যে বিষয়টী ভালবাসে, সেই বিষয়টী লইবার সে অধিকারী। এই বিশেষ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিভাগ কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—

(১) সংস্কৃত পদ্য বা কাব্যগ্রন্থগুলি। সংস্কৃত নাটকগুলি। সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থগুলি। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র ও অলঙ্কার শাস্ত্র। এই বিভাগের প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালা অনুবাদ এবং ইংরাজী হইতে সংস্কৃত অনুবাদ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে।

(২) বেদ। এই বিভাগে নিরুক্তগ্রন্থ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ, গৃহ্যসূত্র ও উপনিষদ এবং আরণ্যক—এই কয়েকটী শ্রেণী-ভেদ আছে। ইহাতেও অনুবাদ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত।

( ) মীমাংসা ও স্মৃতি শাস্ত্র। এই বিভাগে, মীমাংসাগ্রন্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সংহিতা গুলি এবং গৃহ্যসূত্র—এই শ্রেণীভেদ আছে।

(৪) বেদান্ত দর্শন।—এই বিভাগে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—উভয়ই সন্নিবেশিত আছে। তদ্ব্যতীত, প্রধান প্রধান উপনিষদগুলি এবং ভগবদ্গীতা, প্রভৃতি শ্রেণী-ভেদ আছে।

(৫) সাংখ্যদর্শন।—এই বিভাগে সাংখ্য ও যোগদর্শনের অন্যতম গ্রন্থ প্রতিপাদ্যবিষয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ও যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের অংশগুলি নির্দ্দিষ্ট আছে।

(৬) ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন। এই বিভাগে প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের এবং গ্রন্থগুলির প্রতিপাদ্যবিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতা নির্দ্ধারিত আছে।

(৭) সাধারণ দর্শন বিভাগ।—যে সকল ছাত্র সকল দর্শনেরই মোটামোটি ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চায়, তাহাদের জন্য এই বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। এই বিভাগে হিন্দুদর্শনের সকল বিষয়ই নির্দ্দিষ্ট আছে। ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত গীতা ও উপনিষদ—এই সকলেই স্থান পাইয়াছে।

এই সাতটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে, যে ছাত্রের যে বিষয়টী ভাল লাগে, যে বিষয়টীতে যে ছাত্র বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন হইতে ইচ্ছা করে,— সেই ছাত্রকে কেবল সেই একটীমাত্র বিষয় লইতে হইবে। কিন্তু এই একটী মাত্র বিষয়ে তাহাকে চারিটী প্রশ্ন পত্রের উত্তর দিতে হইবে। পাঠক দেখিবেন, এই চারিটী প্রশ্ন-পত্রেই ছাত্রটীর সেই বিষয়-বিশেষে বিশেষ-ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইবার কেমন সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয় গুলিকে সেই ছাত্র ইংরাজী-ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে কিনা, তজ্জন্য অনুবাদের প্রণালীও অবলম্বিত রহিয়াছে। এই প্রকারে সংস্কৃতে, সাধারণ-ভাবে ও বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন করাইবার জন্য, যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা শিক্ষার্থীর পক্ষে কতদূর উপযোগী হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করিয়া দেখুন।

"পোষ্ট-গ্রাজুয়েট"-বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। তখন সংস্কৃতে এম্-এ উপাধি-প্রার্থী ছাত্রকে কেবলমাত্র কয়েক খানি পদ্যগ্রন্থ, সিদ্ধান্ত কৌমুদীর কারক-সমাস, কয়েকখানি নাটক, দুইখানি অলঙ্কার, পিটার্‌সনের সংকলিত ঋগ্বেদের কয়েকটীমাত্র মন্ত্র এবং মুইরের "সংস্কৃত টেক্‌স্‌ট" হইতে একটী রচনা ' লিখিলেই, এম্-এ উপাধি প্রদত্ত হইত। সেই শিক্ষাপদ্ধতি হইতে, নব-প্রবর্ত্তিত এই পদ্ধতি কতদূর উৎকৃষ্টতর এবং বিশেষ ব্যুৎপত্তি-জনক, তাহা পাঠক স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন।

এতদ্ব্যতীত, এই বিভাগে, যাহাতে মাসে মাসে এক খানি করিয়া মাসিক-পত্রিকা

বাহির হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পত্রিকায়, বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-গণের চিন্তার ফল-স্বরূপ, নবাবিষ্কৃত তথ্য যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এই মাসিক পত্রিকার প্রত্যেক খণ্ডে, অন্ততঃ চারিশত পৃষ্ঠা যাহাতে থাকে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই চারিখানা বৃহৎ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থে নানাবিষয়ক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এই পত্রিকাও ছাত্রবর্গের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

যদি কোন অধ্যাপক কোন বিষয়-বিশেষে কোন ভাল গ্রন্থ লিখিতে পারেন, সেই রূপ গ্রন্থ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নানা স্থান হইতে বিশেষজ্ঞগণকে আনিয়া, 'রীডার" নিযুক্ত করিয়া এবং বক্তৃতা দেওয়াইয়া, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া লওয়াও হইতেছে।

এই সকল ব্যবস্থার জন্য কত অর্থের প্রয়োজন, পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন। কোন প্রাইভেট কলেজে, যুগপৎ, এতগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কি সম্ভব ? অথচ এগুলি না হইলেও, শিক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হইতে পারে না।

এই যে আমরা উপরে কেবল এক সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই, সাধারণ বিভাগ ব্যতিতও সাতটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের উল্লেখ করিয়া আসিলাম, ইহাদের মধ্য হইতে কোন একটী বিভাগও বাদ্ দেওয়া যাইতে পারে না। যে কোন একটা বিভাগ বাদ্ গেলেই, শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। মনে করুন, বেদের বিভাগটা পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু একটী ছাত্র যদি প্রাচীন বেদে অভিজ্ঞতা লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়, তখন বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহাকে কি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন ? কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন ? সকল বিভাগ-সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। অথচ, পাঠক আর একটা বিষয় ভাবিয়া দেখুন্। এই সাতটী বিভাগের কোনটাই পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, এই বিভাগ-গুলির প্রত্যেকটার জন্যই ত উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকের আবশ্যক। পূর্ব্ব-লিখিত প্রবন্ধের একস্থানে আমি দেখাইয়া দিয়াছিলাম যে, প্রতি বিষয়ের জন্য একটা করিয়া প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং একটা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালীর অভিজ্ঞ ইংরাজী-শিক্ষায় সুশিক্ষিত অধ্যাপক—এই ভাবে অধ্যাপক লওয়া হইয়াছে। কেন এভাবে অধ্যাপক লওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা প্রথম প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছি। এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য যে সংখ্যক অধ্যাপকের প্রয়োজন, তদপেক্ষা বর্ত্তমানে অধ্যাপকের সংখ্যা কমই রহিয়াছে। একজন অধ্যাপককে দিয়া, তিন চারিটী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নানা শ্রেণীর গ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অর্থের তাদৃশ স্বচ্ছলতা নাই বলিয়াই, এইরূপ করা হইতেছে। কিন্তু তথাপি, গতবর্ষে এরূপ সমালোচনা উঠিয়াছিল যে, গুটীকতক ছাত্রের জন্য অসংখ্য অধ্যাপক লওয়া হইয়াছে! ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া, তবে সমালোচনা করিতে হয়। না জানিয়া শুনিয়া, বাহির হইতে এ প্রকার আলোচনা করা নিতান্তই অসঙ্গত।

যে সকল বিভাগে, নানা শ্রেণীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়ে

অধ্যাপকগণ যে সকল lecture দিবেন, সেই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া, প্রত্যেক বিভাগে ইতিমধ্যেই গ্রন্থ (syllabus) রচিত হইয়া মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং ছাত্রবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তিকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিষয় গুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও, একত্র একসঙ্গে গ্রথিত থাকায় ছাত্রবর্গের পক্ষে, তত্তদ্বিষয়ের একটা একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকায়, বিষয়-বিশেষ গ্রহণ করিবার পক্ষে, কত সুবিধা হইয়াছে। কোন প্রাইভেট্ কলেজে এ প্রকার গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া কি সম্ভব হইত? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ছাপাখানা থাকায়, এই কার্য্য এত সহজ সাধ্য হইতে পারিয়াছে। এই সকল syllabus গ্রন্থ, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরও উপকার সাধন করিতেছে। অনেকে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। পাঠকবর্গ নিজে যদি এই পুস্তিকার একখানাও দেখেন, তবে এগুলির উপযোগিতা * বুঝিতে পারিবেন।

এই সম্পর্কে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থ সমূহের লাইব্রেরীর কথাও উল্লেখ যোগ্য। কত অর্থ ব্যয় করিয়া, এই পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে নানা বিষয়ের কত অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন সংগ্রহ করা হইয়াছে। অপর কোন প্রাইভেট্ কলেজে বা 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' এত গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইত না। এই বিভাগের ছাত্রবর্গ অনায়াসে, যখন যাহা আবশ্যক, তাদৃশ গ্রন্থ লইয়া, জ্ঞানার্জ্জন করিবার কত সুবিধা পাইতেছে। স্বদেশ-নিষ্ঠ, স্বজাতি-প্রেমিক সার্ আশুতোষের অসাধারণ চিন্তাশক্তির প্রভাবে এবং বিশেষ একনিষ্ঠ উদ্যোগে, এই "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" শিক্ষা পদ্ধতি সংস্থাপিত হইয়া, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই সকল ভিতরের কোন তথ্য না জানার জন্যই, লোকে এই বিভাগের নিন্দা করিতে অগ্রসর হয়।

আমি এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র সংস্কৃত-শিক্ষার বিভাগে কি কি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করিলাম। ইহাতেই প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক বিভাগের কথা ও অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিভাগের কথা এই প্রবন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। প্রত্যেক বিভাগেই, সংস্কৃত-বিভাগের অনুরূপ, সাধারণ ও বিশেষ—এই দুইটা অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ-অংশের জন্য চারিটী ও বিশেষ-অংশের জন্য চারিটী—সর্ব্বশুদ্ধ এই আটটী প্রশ্ন পত্রের উত্তর দেওয়া, প্রত্যেক বিভাগস্থ ছাত্রের পক্ষে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। শিক্ষাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বতোমুখী করিবার উদ্দেশ্যে যত্নের কোন ত্রুটি করা হয় নাই। ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রকারে বিষয়-সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয় না। বারাণসীস্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও এতাদৃশ সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ ব্যবস্থা অদ্যাপি অবলম্বিত হয় নাই।

দেশে জমীদার এবং অর্থশালী ব্যক্তির অভাব নাই। যাহারা একটা নিস্ফল মিছিলে

---

* মৎপ্রণীত 'Outlines of the Vedanta Philosophy as set forth by Sankara' পুস্তিকায় শঙ্কর-মতের একত্রনিবদ্ধ সমুদয় তত্ত্বই গ্রথিত আছে। ছাত্রেরা বলিয়াছে শঙ্করের বিপ্রকীর্ণ মতগুলি একত্র পাইবার জন্য, এ পুস্তিকা উপকারে আসিয়াছে।

তিন ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না এরূপ জমীদারের বঙ্গদেশে ত অভাব নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গের উচ্চশিক্ষার জন্য এই যে অশেষ কল্যাণকারিনী প্রণালী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হইয়াছে, ইহার সাহায্যের জন্য, ইহার উন্নতির জন্য, কয়টী অর্থশালী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছেন? হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রে পারদর্শী ছাত্রের জন্য, বৃত্তি বা মেডেল কয়টী প্রদত্ত হইয়াছে? ইউরোপ হইলে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থবর্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কত প্রকারে আর্থিক সাহায্য করিয়া, প্রতিষ্ঠাতৃগণের ও ছাত্রগণের কত উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন! কিন্তু বাঙ্গলাদেশের গৃহের দ্বারে এত বড একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কত চিন্তার ফলে, কত ক্লেশের বিনিময়ে, কত হিতেচ্ছার প্রেরণায়, কত বিঘ্নের অপনোদনে রচিত হইয়াছে, কিন্তু কয়জন ইহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন? সাহায্য * ত দূরের কথা, ভিতরের কোন খবর না জানিয়া, গত বৎসর, এই প্রতিষ্ঠানটীকে লোক-চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে, সভা আহ্বান করিয়া বৃথা নিন্দা ঘোষণা করা হইল? এখনও কোন কোন সংবাদ-পত্রে দোষ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে? হায় রে দেশ! যদি দুই বা একটা অবান্তর অন্য-সংঘটিত দোষ বা ত্রুটি লক্ষিত ই হয়, সেই ত্রুটিকেই কি, 'তিলকে তাল করার মত', অমন করিয়া গাইয়া বেড়াইতে হয়? ইহাই কি সংশোধনের নীতি? ইহাই কি হিতেচ্ছার প্রেরণা? যিনি কত শ্রম-স্বীকার করিয়া, কত বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, এই শিক্ষাপদ্ধতিটাকে ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে এত যত্ন করিতেছেন, সেই মহাপুরুষ স্যর আশুতোষকে কি অমন করিয়া অবমাননার উদ্যোগ করিতে হয়?

এই প্রবন্ধে, science বিভাগের কোন কথা আমি বলিতে পারিলাম না। কেবল, arts-বিভাগের একটামাত্র বিষয়ের বিবরণ দিয়াছি। ইহা হইতেই পাঠক কার্য্যের নূতনত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, আশা করি। এ হেন বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া, দেশে ইহার সমকক্ষ আর কোথায় কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি আছে, যাহাতে আপনারা আপনাদিগের সন্তান সন্ততিকে সুশিক্ষিত করিতে পারিবেন? তাই বলিতেছিলাম যে, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গের পক্ষে, এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করা আত্ম-হত্যার ন্যায় পাপ জনক হইবে।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

* বেদান্ত-সম্বন্ধে lecture দিবার জন্য ও গ্রন্থ রচনার জন্য, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে "শ্রীগোপাল বসু-মল্লিক" নামধেয় একটী Lecturerএর ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার ফল-স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত চারিখণ্ড নানাবিষয় প্রতিপাদক বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বেদান্তের নূতন গ্রন্থ প্রকাশের আশাও বন্ধ হইয়া গেল। হায় রে দেশ!

আমরা কি চাই?

[স্বরাজ বনাম স্ব-সংকল্প বা Self-determination]

প্রশ্নটা আপাততঃ একটু অদ্ভুত শোনায়। বহুদিন হইতেই আমরা একটা কিছুর জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছি। আর সে কিছুটা যে কি, তাহাও বারম্বার শুনিয়াছি ও বলিয়াছি। এত দিন পরে আবার এ কথা তোলা কেন?

বাল্যকালে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, পড়িয়াছিলাম—

> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে।
> দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, এই কলিকাতা সহরে, সতীর্থদিগের সঙ্গে দল বাঁধিয়া গাহিতাম—

> কত কাল পরে, বল ভারত রে
> দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।

বৈঠকে বৈঠকে আবৃত্তি করিতাম—

> চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
> তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
> ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

এইটাকে গদ্যে-পদ্যে, গানে-ছন্দে জ্ঞানে ধ্যানে অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ত এই বস্তু—এই স্বাধীনতাই-চাহিয়া আসিয়াছি, সংবাদ পত্রে, বক্তৃতা-মঞ্চে, সভা সমিতিতে, দেশে বিদেশে এই দীর্ঘকাল এই বস্তুর সাধনাইত করিয়া আসিয়াছি। এত দিন পরে, আজ—"আমরা কি চাই?"—এ প্রশ্ন আবার তোলা কেন?

তুলিতে হইল এইজন্য যে, এতাবৎকাল, আমরা কেবল কথাই কহিয়া আসিয়াছি, কথাই শুনিয়া আসিয়াছি, শব্দেরই আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি। বস্তু-নির্ণয়ের চেষ্টা করি নাই। ইহাতে দোষেরও কিছু নাই। কারণ, সাধনের প্রথমে, শোনাই চাই। সাধনের সূচনা, শ্রবণে। আর বাক্যই শ্রবণের বিষয়।

আর এই বাক্য যেমন বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ ভাবেরও ব্যঞ্জনা করিয়া থাকে। আমরা এতকাল যে কথা কহিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রায়ই কেবল আমাদের ভাবের ব্যঞ্জনামাত্র করিয়াছে, প্রকৃত বস্তু নির্দ্দেশ করে নাই। এইজন্য আমরা এপর্য্যন্ত ভাবের স্রোতেই বেশিটা ভাসিয়া আসিয়াছি, বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া, বস্তুকে এখনও অনুভবেতেও আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি নাই।

এই ভাবও আমাদের অনেকটা অভাব-মূলক ছিল। দুনিয়ার অনেকের যা' আছে, আমাদের তাহা নাই—এই ভাবটাই আমাদিগকে এপর্য্যন্ত চালাইয়া আনিয়াছে।

> চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
> তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
> ভারত শুধুই ঘুমা'য়ে রয়—

এই যে অভাব-বোধ, ইহাই এপর্য্যন্ত আমাদের ভাবের প্রেরণা হইয়াছিল। তারা স্বাধীন, আমরা স্বাধীন নই, এই যে অবমানবোধ—ইহা হইতেই আমাদের দেশহিতৈষার প্রেরণা আসিয়াছিল। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, আমরা এইজন্য, ইংরাজের মতন, মার্কিণীয়দের মতন, ফরাশীয়দের মতন হইতে চাহিয়াছিলাম। বিলাতে যে ভাবের স্বাধীনতা আছে আমরাও সেইরূপ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা এই স্বাধীনতারই সাধনা করিতেছিলাম।

পনর বৎসর পূর্ব্বে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কন্‌গ্রেসে, ৺দাদাভাই নওরজী মহাশয় যখন "স্বরাজের" কথা প্রথম কহেন,—"স্বরাজই" ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সাধ্য ও লক্ষ্য, এই বাণী প্রচার করিলেন,—তখন তিনিও "স্বরাজ" বলিতে এই বস্তুটাই বুঝিয়াছিলেন। তিনি কহেন, ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সাধ্য—

Self-government, as in the United Kingdom or the Colonies, in one word,—Swaraj.

সেদিন হইতে, এই পনর বৎসর ধরিয়া, আমরা সকলে এই "স্বরাজ" কথাটারই আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি। আর আমাদের কথাবার্ত্তায় এপর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, আমরা অনেকেই এখনও এই কল্পনা করিতেছি যে, ইংরাজ-রাজ চলিয়া গেলেই, আমাদের স্বরাজ-লাভ হইবে। অর্থাৎ, ইংরাজ-রাজের অভাবটাই এখনও আমাদের অনেকের নিকটে "স্বরাজ" বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

কথাটা আমার কল্পনা নয়। কন্‌গ্রেসের নূতন নিয়মাবলীতে "ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাই কন্‌গ্রেসের লক্ষ্য," ইহা বলা হইয়াছে। নাগপুরে যখন এই নিয়মের আলোচনা হয়, তখন আমরা কেহ কেহ এই "স্বরাজ" শব্দটীকে "গণ-তন্ত্র" বা democratic-বিশেষণ দিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছিলাম। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া, একটি বন্ধু বলেন—'রণজিৎ সিংহের মতন কোনও বীরপুরুষ যদি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, দেশকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে আমরা কি তাঁহাকে আমাদের স্বরাজের অধিনায়ক বলিয়া বরণ করিয়া লইব না ?' সুতরাং, "স্বরাজ" যে গণ-তন্ত্রই হইবে, এমন কোনও কথা নাই।' ভারতের "স্বরাজ" রাজ-তন্ত্র হইতে পারে, আত্ম-তন্ত্র হইতে পারে, প্রজা-তন্ত্র হইতে পারে। যা' হবার তা' হ'বে, আগে হইতে আমরা এই স্বরাজকে কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার বা আয়তন দিতে যাই কেন ?"

এই সে-দিন বরিশালে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ও এই কথাই কহিয়াছেন—

"স্বরাজ মানে কি ? অনেকে বলেন, এই স্বরাজ democratic (গণ-তন্ত্র মূলক) স্বরাজ। কিন্তু যখনই আমরা এই স্বরাজকে একটা বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করিতে যাই, তখনই আর স্বরাজ থাকে না। স্বরাজ—স্বরাজ। ইহা আবার democratic, autocratic কি ? স্বরাজ democratic, কি monarchical, কি republic, কোনটাই মোটেই নয়। ইংরাজ বলে—right of self-determination। কিন্তু আমাদের বেলায়, এই self-determinationএর অধিকার স্বীকার করে না। যেদিন আমরা আমাদের এই অধিকার উপলব্ধি করব, সেইদিনই আমাদের স্বরাজ লাভ হবে।"—জনশক্তি, ১লা বৈশাখ, ২পৃষ্ঠা।

৺দাদাভাই নাওরজী স্বরাজ বলিতে self-government as in the United Kingdom or the Colonies, বুঝিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন বাবু এখন স্বরাজ বলিতে, মনে

হয়, উইলসন সাহেবের self determination বুঝেন। দাদাভাই নাওরজীর আদর্শ গ্রহণ করি বা না করি, কথাটা বুঝিতে পারি। স্বরাজের ঐরূপ একটা অর্থ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু বাক্যের সঙ্গে অর্থের যদি কোনও নিত্য সম্বন্ধ থাকে—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে

মহাকবির এই উক্তির যদি কোনও সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে, স্বরাজ যে কি করিয়া self-determination বুঝায়, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা, অন্ততঃ আমার মত লোকের পক্ষে, অসাধ্য।

স্ব এবং রাজ এই দুইটি কথার যোগে "স্বরাজ" শব্দের উৎপত্তি। 'স্ব'র একটা অর্থ আছে। ইংরাজিতে এই 'স্ব'কে self বলা যায়। 'স্ব' অর্থ আমি, নিজে, আত্মা। Self অর্থও তাই। কিন্তু "রাজ" শব্দের অর্থ কি করিয়া determination হয়, এপর্যান্ত বুঝিতে পারি নাই। হয় না, বা হইতে পারে না, এমন কথা বলার সাহস আমার নাই। পণ্ডিতেরা সব করিতে পারেন। বিশেষতঃ এমন কোনও শব্দ বা ধ্বনি নাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শব্দকোষের সাহায্যে যাহার একটা অর্থ করা যায় না।

যৌবনে একপ গল্প মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। একজন পাদ্রি-সাহেব একবার শ্রীকৃষ্ণকে rascal বলিয়াছিলেন। দেবতার অবমাননা করিতেছেন বলিয়া, ইহার প্রতিবাদ হইলে, তিনি তাঁর স্কুলের পণ্ডিতের শরণাপন্ন হন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আপনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বচ্ছন্দে "রাসকেল" কহিতে পারেন। সংস্কৃতে "রাস কেল" শব্দে কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়; রাসে যিনি কেলী করেন, তিনইত শ্রীকৃষ্ণ।

এইরূপে পাদ্রিরা যিশুখৃষ্টকে একবারে নারায়ণ বলিতে আরম্ভ করেন। একটি ইংরাজ মহিলা ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একথা বলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মহিলাটি কহিলেন, 'আপনি উপহাস কচ্ছেন কেন? নরের সমষ্টি নার, এই নারের অয়ন বা আশ্রয় যিনি তিনইত নারায়ণ। আমাদের যিশু ত তাহাই।' শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—'আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের এমনি অদ্ভুত শক্তি আছে যে, আমরা তাহার দ্বারা দুনিয়ায় সকল শব্দেরই একটা অর্থ করিয়া লইতে পারি।' মহিলাটি কহিলেন,—'আমার নামের একটা সংস্কৃত অর্থ করতে পারেন?' শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—'পারি বই কি। আপনার নাম বলুন। এমি বারবারা, এমি অর্থ যাইতেছি, বারবারা অর্থ জল খাবার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বা উপাদান।' মহিলাটি হো, হো, করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—'তবে আপনাদের সংস্কৃতে আমাকে একটা জলবরী করে। শাস্ত্রী মহাশয়—'আমাদের ব্যাকরণ সব করতে পারে।'

সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে স্বরাজ শব্দ যে self-determination হইতে কখনও পারে না, অমন কথা কহিবার আমার সাহস নাই। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন হইতে, এই ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে বরিশালে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কেবল আমি নই, কিন্তু এদেশে যখন যিনি এই স্বরাজ কথা ব্যবহার করিয়াছেন, বা ইহা লইয়া যুক্তি বিচার, আন্দোলন আলোচনা করিয়াছেন, তাঁরা সকলে স্বরাজের যে অর্থ এতাবৎ-

কাল করিয়াছেন, তাহা যে এই self determination নয়, একথা সাহস করিয়াও বলিতে পারা যায়।

আর আজ যে চিত্তরঞ্জন বাবু স্বরাজের এই নূতন অর্থ করিলেন, ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, এতকাল আমরা কেবল স্বরাজ শব্দেরই কথা শুনিয়া ও কহিয়া আসিয়াছি, ইহা যে কি বস্তু, তাহা অনুভবে প্রত্যক্ষ করি নাই। যে শব্দের বস্তুজ্ঞান আছে, তাহার একটা অভিনব অর্থ হঠাৎ কেহ করিতে যায় না।

স্বরাজের অর্থ যদি সত্যই self-determination হয়, তাহা হইলেও একটা গোল উঠে। উইলসন সাহেব, এই গত জার্ম্মান যুদ্ধের মাঝখানে, এই কথাটা প্রচার করেন। আমরা ত তার পূর্ব্বে এ প্রসঙ্গে একথা শুনি নাই এবং কখনও প্রয়োগ করি নাই। এই self-determination কথাটাতে যে অর্থ জ্ঞাপন করে, সে অর্থবোধও ত ইহার পূর্ব্বে আমাদের হয় নাই। সে ভাব ত আমাদের অন্তরে ইহার পূর্ব্বে জাগে নাই। ভাব জাগিলে, তাহার ভাষাও থাকিত। আমাদের নিজেদের ভাষা থাকিলে, আজ চিত্ত বাবুকেও ত এই ইংরাজি কথাটা লইয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইত না। কিন্তু এই self determination কথা প্রচারিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমরা "স্বরাজ" শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। তখন আমরা "স্বরাজ" বলিতে কি এই অজ্ঞাত-অর্থ, অশ্রুত-ধ্বনি, self-determination শব্দই বুঝিতাম? আর তখন যদি দেশের জনসাধারণে স্বরাজ বলিতে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের ব্যঞ্জনা বুঝিতেন, তাহা হইলে আজ চিত্ত বাবুর পক্ষে এরূপভাবে "স্বরাজ—স্বরাজ," "স্বরাজ,—self-determination" এসকল কথা বলার কোনই অবসর থাকিত না। চিত্ত বাবু নিজেই কহিয়াছেন—

> আমরা কেবল গত তিন-চার মাস যাবৎ স্বরাজের কথা বলছি না। আমরা অনেক দিন যাবৎই বঙ্গদেশে স্বরাজের কথা বলছি—স্বরাজ চেয়ে আসছি। বঙ্গদেশে স্বরাজের কথা নূতন নহে। কিন্তু কথাটির সারমর্ম্ম আমরা এখন পর্যান্ত সকলে গ্রহণ করতে পারি নাই।

কিন্তু আমরা কি ইহার কোনও মর্ম্মই বুঝি নাই? ৺দাদাভাই ইহার কি অর্থ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই পনর বৎসর কালই শুনিয়া আসিয়াছি। ইংরাজের নিজের দেশে কিম্বা ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহে যে প্রণালীর শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, দাদাভাই তাহাকেই স্বরাজ বলিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে একদল লোক তখনই এই ঔপনিবেশিক বা colonial আত্ম-শাসনের আদর্শ প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, স্বরাজের অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দাদাভাইএর ব্যাখ্যাতে একটু গোলও ছিল। যে আকারের আত্ম-শাসন বা self government ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেও তিনি স্বরাজ কহিয়াছিলেন। আবার, ইংরাজের উপনিবেশে—অর্থাৎ ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বা দক্ষিণ আফ্রিকায়—যে শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেও তিনি এই স্বরাজেরই রূপ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিবেশ সমূহ, কাজে না হউক, অন্ততঃ লেখাপড়ায়, আইন-কানুনে, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। পনর বৎসর পূর্ব্বে, অন্ততঃ এ সকল উপনিবেশের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় নাই। আজ তাহা একরূপ ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, ইংরাজ আজ তাহাদিগকে আপনার মন্ত্রী-

সমাজে ডাকিয়া আনিয়া, সাম্রাজ্য-নীতির পরিচালনায়, নিজের মন্ত্রীদিগের সমান আসন দিয়াছেন। পনর বৎসর পূর্ব্বে ইহা হয় নাই। সুতরাং, এই ঔপনিবেশিক বা colonial শাসনকে, ঠিক স্বরাজ বলা যাইত না। তারপর, এ সকল উপনিবেশের লোকেরা ইংরাজের স-গোত্র, স-বর্ণ। ইহাদের সঙ্গে ইংরাজ যে ভাবে সহজে সম্মিলিত হইয়া, এক যোগে সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারে, ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ও অনেক সময় পরস্পর বিরোধী যাহাদের স্বার্থ ও সাধনা, তাহাদিগকে সেরূপভাবে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারে না। এ সকল কারণে, আমাদের মধ্যে একদল লোকে, ৺দাদাভাই নাওরোজীর এই স্বরাজের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ইঁহারা স্বরাজ বলিতে ভারতের নিজের রাজ, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই বুঝিয়াছিলেন। এই বিষয়ে লোকের মনে বিশেষ গোল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তখনও ইঁহারা স্বরাজের চারিটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন--

প্রথম—দেশের লোকে নিজেরা দেশের শাসন-সংরক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর কত পরিমাণ রাজস্বের প্রয়োজন, ইহা ঠিক করিবে, এবং কিরূপে এই রাজস্ব ধার্য হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

দ্বিতীয়—দেশের লোকে নিজেরা দেশের আইন কানুন বিধিবদ্ধ করিবে।

তৃতীয়—দেশের লোকে নিজেরা এই সকল আইন-কানুন অনুযায়ী দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান করিবে।

চতুর্থ—দেশের লোকে নিজেরা দেশের শান্তির ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

এ সকল বিষয়ে অন্য কোনও দেশের লোকের কোনও হাত বা অধিকার থাকিবে না।

পনর বৎসর পূর্ব্বে, স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সকল আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়, তাহা হইতে, স্বরাজের এই কয়টা লক্ষণ পাওয়া যায়। আর এ সম্বন্ধে ৺দাদাভাই স্বরাজের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এই অর্থের কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতিও ছিল না। কারণ, বিলাতে যে আত্ম-শাসন বা self government প্রতিষ্ঠিত, আর ইংরাজের উপনিবেশ সমূহে যে প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা আছে, এই উভয় ক্ষেত্রেই, আত্ম-শাসনের এই চারিটি মুখ্য অঙ্গ পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়াছে।

অতএব, স্বরাজ বলিতে আমরা এতাবৎকাল আর যাহাই বুঝি না কেন—কথাটির সারমর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারি বা না পারি—ইহা ঠিক যে, স্বরাজ যে self-determination, চিত্ত বাবুর বরিশালের বক্তৃতার পূর্ব্বে, এ অর্থ এদেশে আর কেহ করেন নাই।

এ পর্য্যন্ত স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটা বিষয়েই গোল ছিল,—নিজেদের মনেও ছিল, পরস্পরের মধ্যেও ছিল। সে বিষয়টি—ভারতের স্বরাজ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, না বহির্ভূত হইবে? একদল বলিতেছিলেন, ইহা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। আর একপক্ষ বলিতেছিলেন, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ত পররাষ্ট্র, অপরের রাজ্য, অন্যের, ব্রিটিশের আয়ত্তাধীনে। পরের আয়ত্তাধীনে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হয়, কিরূপে? ভারতের আত্ম-শাসনে বা স্বরাজে, ভারতের নিজের অধিকার কোন্‌খানে গিয়া ঠেকিবে, আর কোন্ খানেই ইংরাজ-রাজের অধিকার আসিয়া বসিবে? পনর বৎসর পূর্ব্বে, এ সকল তর্ক উঠে; মীমাংসার পথ ভাল করিয়া দেখা যায় নাই। কিন্তু মোটের উপরে, দেশের মধ্যে যাঁহারা এ সকল বিষয়ের

বিচার-আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বরাজ বলিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝিয়াছিলেন। এই স্বাধীনতার সঙ্গে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ কতটা, কিরূপ দাঁড়াইবে,—সম্বন্ধ আদৌ থাকিবে কি না,—এ কথার মীমাংসা করিবার কোনও চেষ্টাই হয় নাই। আর এই পনর বৎসর পরে, আমরা আজও যে এ বিষয় একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিয়াছি, এমন বলা যায় না। কারণ, এই সে-দিন, নাগপুরে যখন কন্‌গ্রেসের বৈঠক হয়, তখনও মহাত্মা গান্ধি পর্য্যন্ত একজন ইংরাজ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, হয় আমরা ইংরাজের কল্যাণে স্বরাজ-পাইব, না হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে এই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে—"Either through the good offices (কল্যাণে) of the British, or outside the British Empire."

Self-determination কথাটারই বা ইতিহাস কি ? জর্ম্মাণ-যুদ্ধে যোগ দিবার সময়, যুদ্ধের শেষে, যুযুৎসু রাষ্ট্রশক্তি সকলের অধীনে যে সকল পররাষ্ট্র বা অধীন জাতি ছিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিরূপে হইবে, ইহার মীমাংসার সূত্র বা নীতি স্বরূপেই উইলসন সাহেব এই self-determination কথাটা তুলেন। Self মানে, স্ব বা নিজে, আর determination অর্থ সংকল্প। এই নীতির অর্থ, এই যে, এ সকল পরাধীন বা পররাষ্ট্রান্তর্গত জাতি, যুদ্ধের অবসানে, আত্ম-সংকল্পের দ্বারা, ভবিষ্যতে তাহারা কিরূপ শাসনাধীনে বাস করিবে, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর্ম্মেনীয়ার কথা বলা যাইতে পারে। জর্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে, আর্ম্মেনীয়া তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অধীনে ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধের পরে, আর্ম্মেনীয়া তুর্কীর অধীনেই থাকিবে, না, ইংরাজের বা ফরাসীদের বা অন্য কাহারো শাসনাধীনে যাইবে, কিম্বা নিজে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া নিজের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইবে, আর্ম্মেনীয়ার অধিবাসীরা নিজেরাই ইহা ঠিক করিয়া লইবে। তাহারা নিজেরা এ বিষয়ে যে সংকল্প বা determine করিবে, তাহাই অপর সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। উইলসন সাহেবের 'self-determination'এর অর্থ ইহাই।

আর উইলসন যে অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, সে-অর্থে এই self-determination বা আত্ম-সংকল্পকে "স্বরাজ" বলা যায় কি ? জর্ম্মান যুদ্ধের সময় আর্ম্মেনীয়ার স্বরাজ ছিল না। কারণ, আর্ম্মেনীয়া তখন পরকীয় রাষ্ট্র-শক্তির অধীনে ছিল। আর এই যুদ্ধের পরেও, আর্ম্মেনীয়া যদি নিজের ইচ্ছায় তুর্কীর অধীনেই থাকিতে চাহিত, কিম্বা ইংরাজের বা ফরাসীদের শাসনাধীনে নিজকে স্বেচ্ছায় স্থাপন করিত,—তাহা হইলে সে self-determination'এর অধিকারটা জাহির করিত বটে, কিন্তু স্বরাজ-লাভ করিয়াছে, এমন কথা কেহ কহিত কি ?

চিত্ত বাবু এ কথাটা যে জানেন না, বা বুঝেন না, বা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এমন নয়। কারণ তিনি স্পষ্টই কহিয়াছেন—স্বরাজ আবার democratic, autocratic কি ? স্বরাজ democratic, কি monarchical, কি republic, মোটেই নয়। অর্থাৎ, স্বরাজ democraticও হ'তে পারে, monarchicalও হ'তে পারে, republicও হ'তে পারে। দেশের

লোকে যা ইচ্ছা করবে, তাই হবে, আর তাই স্বরাজ। সুতরাং, আর্মেনীয়া যদি স্বেচ্ছায় তুর্কীর বা আর কারো শাসন-শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া লইত, তাহা হইলে চিত্ত বাবুর অভিধানে, সেই বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত।

দেশের লোকে যা' ইচ্ছা করবে, তাই হওয়া তাহাদের জন্ম গত-স্বাধীনতা-সঙ্গত, ইহা সত্য। আর-এই স্বাধীনতার উপরে হাত দিবার অধিকার কাহারও নাই, এ কথাও মাথা পাতিয়া মানিয়া লই। কিন্তু, দেশের লোকে যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার পায়ে বা গলায়, আপনার হাতে, মৃত্যুর শৃঙ্খল আঁটিয়া দেয়—তাহাকে কি জীবনের পথ বলিব না মৃত্যুর পথই বলিব?

শ্রেয় আর প্রেয়, যাহা কল্যাণকর আর যাহা প্রীতিকর, এই দুই-ই জীবের সম্মুখে আছে। জীব স্বাধীন। স্বেচ্ছায় সে শ্রেয়কেও অবলম্বন করিতে পারে, প্রেয়কেও অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু, এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া জীব যখন স্বেচ্ছায় শ্রেয়কে বর্জ্জন করিয়া, প্রেয়কে অবলম্বন করে, তখন সেই স্বেচ্ছাবলম্বিত প্রেয় কখনও শ্রেয় হইয়া যায় না। জীবের আত্ম সংকল্প বা self determination প্রয়োগের পূর্ব্বে যেমন পরেও সেইরূপ, সে অবলম্বন করুক আর নাই করুক শ্রেয় শ্রেয়ই থাকিয়া যায় প্রেয় প্রেয়ই থাকিয়া যায়।

দেশের লোক যাহা চাহিবে তাহাই হইবে—তাহাও হওয়া স্বাধীনতার মূলনীতি-সঙ্গত। কিন্তু তাই বলিয়া, দেশের লোকে যদি ইংরাজ-রাজের অধীনেই চিরদিন বাস করিতে চাহে, তাহা যে ভারতের স্বরাজ হইবে, স্বরাজ শব্দের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, পুরাতন ব্যবহার ও ইতিহাস—এ সকলকে একান্ত নির্ম্মূল না করিলে, এমন কথা বলা যায় কি?

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যদি এই বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণকে ডাকিয়া, তাঁহারা ইংরাজ-রাজের অধীনে থাকিতে চান কি না, এই প্রশ্ন করা যাইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা তখন প্রায় একবাক্যে কহিতেন,—'হাঁ, ইংরাজ-রাজ্যেই আমরা থাকিতে চাই—কোম্পানী বাহাদুরের জয় হউক।' সে অবস্থায় এই বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসনই ত বাঙ্গালার আত্ম-সংকল্পের বা self-determination এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হইত। তখন কি ইংরাজ রাজই বাঙ্গলার স্বরাজ হইত?

এই যে দেড় বৎসর পূর্ব্বে, অমৃতসরের কন্‌গ্রেসে, গান্ধি মহারাজ ভারত-শাসনের নূতন সংস্কার যাহাতে আপনার ঈপ্সিত লক্ষ্য-লাভ করে, তাহার জন্য ইংরাজ আমলা-তন্ত্রের সঙ্গে সাহচর্য্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই বিষয়ে যাহাতে কন্‌গ্রেস, ইংরাজকে loyal co-operation অর্পণ করে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এর কন্‌গ্রেস তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে নারাজ হইলে, তিনি আর একটা কর্ম্মক্ষেত্র (another platform) অন্বেষণ করিবেন, এই ভয় দেখাইয়াছিলেন, কন্‌গ্রেস যদি গান্ধি মহারাজের মতই গ্রহণ করিত, তাহা হইলে, "মণ্টেগু-মাকালই" কি ভারতের "স্বরাজ" হইয়া যাইত? সে-অবস্থায় এইমাত্র বুঝা যাইত যে, কন্‌গ্রেস বর্ত্তমান ব্রিটিশ-রাজের অধীনে থাকিতেই রাজী আছে। কিন্তু, কোনও জাতি, অন্য জাতির শাসন-সংরক্ষণাধীনে থাকিতে রাজী হইলেই, পরাধীনতা স্বাধীনতা হইয়া যায় না।

আপাতত মনে হয়, দেশের অনেক লোক বর্ত্তমান শাসনাধীনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ যদি ইংরাজ, দেশের সাধারণ প্রকৃতি-পুঞ্জকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া, গ্রামে গ্রামে

সভা ডাকিয়া বলেন—"তোমরা বড় দুঃখে আছ, জানি। তোমাদের পেটে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই। তোমাদের গ্রামে বৎসরে ছয় মাস ঠাণ্ডা, পরিষ্কার জল মিলে না। গ্রামান্তরে যাইবার পথঘাট নাই। রোগে তোমরা ঔষধ পাও না, রোগও তোমাদের ছাড়ে না। আমাদের কর্ম্মচারীরা তোমাদের উপরে বড় জুলুম করে। এতদিন আমরা এ সকল ভাল করিয়া জানি নাই। তোমাদের দুঃখ দারিদ্র বুঝি নাই। আমরা তোমাদের মা বাপ, পুত্রের ন্যায় তোমাদের প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য ছিল। আমরা করি নাই, তার জন্য অনুতপ্ত। এখন হইতে তোমরা তিন টাকা মণে চাউল পাইবে, বাজারে একটাকা জোড়ায় কাপড় কিনিতে পারিবে, তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় ভাল পুষ্করিণী কাটিয়া দেওয়া হইবে। ম্যালেরিয়া ওলাওঠা প্রভৃতি যাহাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা যাইবে, আমাদের দাতব্য ঔষধালয়ে তোমরা ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইবে, অজন্মা হইলে আমাদের গোলাগোলা হইতে অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে চাল পাইবে।" এই বলিয়া, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগের কমিসনার ও অপরাপর উচ্চতন রাজকর্ম্মচারীরা যাইয়া যদি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রজার অভাব অনটন দুঃখ দারিদ্র প্রভৃতি তাঁরা মা বাপের মতন দূর করিতে চেষ্টা করিবেন, প্রজারা অবাধে তাঁহাদের নিকট যাইয়া নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও জানাইতে পারিবে। আর এই প্রতিজ্ঞার পরে যদি দেশের জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহারা এ অবস্থায় ইংরাজ-শাসনের অধীনে থাকিতে চান কি না? আমার বিশ্বাস, দেশে এখনও এমন মোহ আছে যে, অধিকাংশ লোকে হাত তুলিয়া ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ইংরাজের রাজ্যে বাস করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে। এ অবস্থায় এই ইংরাজ-রাজই ভারতের প্রকৃতি-পুঞ্জের আত্মসংকল্পের বা self-determination এর উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আর চিত্ত বাবু স্বরাজের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই যদি ইহার সত্য অর্থ হয়, তাহা হইলে, এই বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজত্ব ত আমাদের স্বরাজ হইতে পারে। এই ইংরাজ-রাজ democratic বা গণ-তন্ত্র নয়, ইহা autocratic বা আত্ম-তন্ত্র বা ইহা bureaucratic বা আমলা-তন্ত্র। যাই হউক না কেন, তাহাতে ত আসিয়া যায় না। কারণ, "স্বরাজ আবার democratic, autocratic, bureaucraticই বা কি?"

কিন্তু স্বরাজ "কথাটির সারমর্ম্ম আমরা এখন পর্য্যন্ত সকলে গ্রহণ করতে" পারিয়া থাকি বা না থাকি, ইহা ঠিক ও সর্ব্ববাদী সম্মত যে, ইংরাজ-রাজ যতদিন আছেন, আমাদের স্বরাজ ততদিন হইবে না, এতাবৎকাল এই ধারণাই ছিল। কিন্তু, চিত্ত বাবু স্বরাজের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বরাজ অর্থ যদি self-determinationই হয়, তাহা হইলে, এই স্বরাজের সঙ্গে ইংরাজ-রাজের কোনও অপরিহার্য্য বিরোধ ত হয় না।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মির্জাফর, জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি বাঙ্গালার জননায়কেরা ইচ্ছা করিয়া, ইংরাজকে ডাকিয়া আনিয়া, বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়া দিলেন। অতএব, বাঙ্গালার লোকের self-determination এর কিম্বা আত্মসংকল্পের বলেই ইংরাজ আমাদের রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং, যতদিন না বাঙ্গালার লোকেরা বা লোকনায়কেরা অন্য সংকল্প করিতেছেন, ততদিন ইংরাজ-রাজকেই আমাদের "স্বরাজ" বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

আর আজ যদি দেশের লোকে বা লোকনায়কেরা, লোকমতের অনুকূলে, ইংরাজের সঙ্গে একটা রফা করিয়া, আত্ম-সংকল্পের বা self-determination এর দ্বারাই, ইংরাজের অধীনে থাকিতে রাজি হয়েন, তাহা হইলে, বর্ত্তমান "শয়তানী" বিটিশ রাজই, চিত্ত বাবুর ব্যাখ্যা অনুসারে, আমাদের স্বরাজ হইয়া যাইতে পারে।

এরূপ রফা হওয়ার যে কোনও সম্ভাবনা নাই, এমনও ত বলা যায় না। ইংরাজ রাজপুরুষেরা যে এরূপ আশা পোষণ করেন না, তাহাও নয়। সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালার লাট বাহাদুর পর্য্যন্ত যে "স্বরাজ"-ঘোষণা করিতেছেন, তাহাই ইহার প্রমাণ।

গান্ধি মহারাজও যে রফা হওয়া অসম্ভব মনে করেন, তাহাই বা বলি কিরূপে? কারণ, এই সে-দিন, নাগপুরে যখন কংগ্রেসের বৈঠক বসে, তখনও তিনি একজন ইংরাজ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে কহিয়াছিলেন যে, ভারতে হয় বিটিশের কল্যাণে (through the good offices of the British) অন্যথা বিটিশ-সাম্রাজ্যের বাহিরে (outside the British Empire) তাঁহার ঈপ্সিত 'স্বরাজ' লাভ হইবে।

ফলত স্বরাজ আর self-determination বা আত্মসংকল্প যদি একই বস্তু হয়, তবে স্বেচ্ছাকৃত বন্ধনকেও মুক্তি বলিতে হইবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জগাই-উদ্ধার।

এ কি মাধাই করলে, ওরে, আমায় কিনা টানলে বুকে?
জড়িয়ে ধরে কাঁদলে গোরা কতই যেন তৃপ্ত সুখে।
নবদ্বীপের সবাই যাকে করত ঘৃণা ক্রিমির মত,
ছিলাম যেন কুষ্ঠ রোগীর দুষ্ট অতি গলিত ক্ষত,
রাক্ষসেরি মতন যাকে দেখত নারী সভয় ত্রাসে,
দানব সম ভীষণ অতি ছিলাম যেন আপন বাসে।
স্বজন কেহ চাইত না'ক, নাইকো আমি মানুষ যেন,
হয়তো, মাধাই, জগৎ মাঝে পায়নি ঘৃণা কেহই হেন।
তার উপরে ভীষণ কত অত্যাচারে গোরায় দহি,
মানুষ যাহা সইতে নারে নিমাই, ওরে, সে সব সহি--
জড়িয়ে মোরে বক্ষে নিলে, আমিই যেন বন্ধু মিতে,
আমিই যেন প্রিয়ের প্রিয়, এমনি ধারা বাঁধলে হৃদে।
জুড়িয়ে দিলে, ভরিয়ে দিলে, প্রাণটা যেন অগাধ স্নেহে,
সাত সাগরের সুধার ধারা উথলে ওঠে সকল দেহে।
মানুষ এমন মিষ্টি, মাধাই, এমন ভাল বাসতে পারে?
জন্মটা যে বদলে গেল গোরার শীতল অশ্রু ধারে!

শ্রীবলাই দেব-শর্ম্মা।

তান্ত্রিক শিব-শক্তি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান।

বাহ্য জগতের বৈচিত্র আমরা সকলেই গ্রহণ করিতেছি। যদি সংবস্তু একই হয়, তাহা হইলে, জগতের বহুত্ব কোথা হইতে আসে, আর কেনই বা প্রতীয়মান হয়, এই বহু-নাম রূপের কারণ কি, কেনই বা অনুভূত হয়, এটা একটা গূঢ় সমস্যা। এ সমস্যা চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিবে। তবে, কথনও কথনও পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণবিবেকী পুরুষও আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। তাঁহারা এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন ও করিবেন।

অদ্যকার বিবেচ্য বিষয়টা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথানুসারে আলোচনা করা যাউক। যথন আমি প্রথম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry), পরে ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞান-শাস্ত্র (Physics) এবং তদানুসঙ্গিক অঙ্ক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তথন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গবেষণায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে বাহ্যজগতের প্রকৃত মূল-কারণ (absolute cause) অজ্ঞাত (unknown) এবং অবোধ্য (unknowable) এই বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইত। রসায়নশাস্ত্রানুসারে প্রথমত চৌষট্টিটি, পরে সত্তরটা, পরে ক্রমে আরো বেশী, দিন দিন পচাত্তরটি ছিয়াত্তরটা মৌলিক পদার্থ (elements) এবং ঐ মৌলিক পদার্থের সংযোগ-বিয়োগে বাহ্যজগতের বহুপ্রকার নামরূপধারী বস্তুরে দুই অথবা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংঘাত (compounds) বলিয়াই, রসায়ন শাস্ত্র এক প্রকার নীরব ছিলেন। যদিও আমি তথন অনেকটা অপরিণাম-দর্শী যুবকমাত্র ছিলাম, তথাপি আমার মনে খট্‌কা উপস্থিত হয়—মৌলিক পদার্থ ৬৭টি ৭০টি কি ৭৫টি কেন হইবে, এবং কিরূপে হইতে পারে? এক হইতে পারে যে, সেগুলি অসংখ্য, অথবা অপর পক্ষে হইতে পারে যে, তাহারা কেবল এক বস্তুরই—এক মৌলিক পদার্থেরই-রূপান্তর মাত্র। এক সংবস্তুই নানা প্রকার নামরূপ ধারণ করিয়া জগতের বৈচিত্র ঘটাইতেছেন। একথা মনে উদয় হওয়ার একটা প্রধান কারণ ছিল। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ও স্বর্গীয়া মাতৃদেবী তন্ত্র-শাস্ত্রানুসারে তান্ত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন, সেই তন্ত্র-শাস্ত্রে অনুশাসিত হইয়া, সর্ব্বদাই পূজা অর্চ্চনা করিতেন, আমার গর্ভাদষ্টম বর্ষে, আমাদিগের বংশনিয়মানুসারে, যজ্ঞোপবীত দিয়াছিলেন, এবং তাহার এক বৎসর মধ্যে, যখন আমার বিদেশে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবে স্থির হইল, তথন পিতামাতা উভয়ে যুক্তি করিয়া, আমাকে আগমানুযায়ী নিয়মে দীক্ষিত করিলেন। পিতা মন্ত্র-বিচার করিলেন; মাতা হইলেন, মন্ত্রদাত্রী গুরু। সেই সময় হইতেই, আমার জ্ঞানগম্য উপায়ে, মোটামুটি, শিব-শক্তির পরিচয় তাঁহারা দিয়াছিলেন। তথন হইতেই, মনে একটা সংস্কার, একটা ধারণা হইয়াছিল, যে বাহ্য-জগতের নাম-রূপ, সেই শিব-শক্তির বিকাশ-মাত্র। সেই শিব-শক্তি সৃষ্টির ব্যাপারে দ্বিধা, এবং পরে বহুধা হইলেও, তাহারা পরম শিব-রূপে এক, এবং সেই একই সংবস্তু। অতএব, আমার মনে যে খট্‌কাটা হইয়াছিল বলিলাম, হওয়াটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

যাহা হউক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়েই আরো কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, Sir William Crookes নামক একজন রসায়নশাস্ত্রাধ্যাপক যিনি রেডিওমিটার (Radio-meter) নামক যন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন,—তিনিপ্রথমে আভাষ দিলেন যে, যাহাকে আমরা জড়-পদার্থ (matter) বলি, সেটী এক এবং তদানিন্তনের রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ সকল সেই এক জড়

বস্তুর রূপান্তর মাত্র। ক্রমে বিজ্ঞানশাস্ত্রের গবেষণা চলিতে লাগিল। তাহার ফলে—সেই গবেষণায়—এখন একটা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সেটা সর্ব্বব্যাপী আকাশের (ether) আবর্ত্তন মাত্র। অর্থাৎ, সর্ব্বব্যাপী আকাশ, প্রাণবায়ু দ্বারা প্রকম্পিত হইলে, ক্রমে বাহ্যজগতের বস্তুজগতের, নামরূপ ধারণ করে। আরও জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যাহাকে আমরা পরমাণু (atom) বলিয়া অভেদ্য মনে করিতাম, সে পরমাণুও এক একটা ক্ষুদ্র জগৎ, কতকটা সৌর জগতের ন্যায়। যেমন সৌর জগতের কেন্দ্রস্থানে সূর্য্য থাকিয়া গ্রহমণ্ডলকে অনুশাসিত এবং গতিশীল করিতেছেন, সেই প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্রিয়া-বিহীন অথচ ক্রিয়ার অনুশাসক তড়িৎ বিন্দু (nucleus of positive electricity), কেন্দ্রে থাকিয়া, ক্রিয়াশীল এবং গতি-শীল তড়িৎ-বিন্দু (ions or charges of negative electricity) সমূহকে গতিশীল এবং ক্রিয়াশীল করিতেছে। যতক্ষণ, এই কেন্দ্রস্থ তড়িৎ-বিন্দু দ্বারা তাহারা অনুশাসিত হইয়া, সেই বৃত্তস্থিত তড়িৎ-বিন্দু সমূহ অতি বেগে ধাবিত হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই পরমাণুর পরমাণুত্ব। ঐ পরমাণু দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্ম স্থূল বস্তু জড় জগতের নাম-রূপ ধারণ করে। কয়েক বৎসর হইল, Radium বলিয়া একটা রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার স্বভাব, কিন্তু, উপরে যাহা বলিয়াছি তাহার বিপরীত। সে তাহার স্থলস্থ অতিবেগে কেন্দ্র হইতে ছড়াইয়া দিতেছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যদি সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি নষ্ট হইয়া, বিক্ষেপণী শক্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে, সৌর-জগৎ ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব, পরমাণু সমষ্টির সংঘাতে বাহ্যজগতের সৃষ্টি, এবং পরমাণুর বিক্ষেপণায় বাহ্য জড় বস্তুর নাশ—প্রলয়।

এখন দেখা যাইতেছে, সূক্ষ্ম আকাশ হইতে ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর, হইয়া জগতের সৃষ্টি, এবং পুনরায় এই স্থূল বস্তুর বিক্ষেপণ হইলে, ক্রমে ক্রমে আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আকাশে পরিণত।

এই স্থানে আর একটা বিচার্য্য বিষয় আছে। এই যে, কেন্দ্রস্থ মৌলিক তড়িৎ-বিন্দু—যাহা পরমাণু মণ্ডলের অনুশাস্তা এবং যাহাকে পরে আমরা 'মৌলিক তড়িৎ বিন্দু' (positive) বলিব, এবং গতিশীল বৃত্তস্থ তড়িৎ-বিন্দু—যাহা 'অনুশাসিত তড়িৎ-বিন্দু' (negative) বলিতেছি ও বলিব, —এই দুইটা না থাকিলে পরমাণুর বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু যদি, কোন কারণে, 'মৌলিক তড়িৎ-বিন্দু', 'অনুশাসিত তড়িৎ বিন্দু'র সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোন প্রকার বাহ্য-বিকাশ সম্ভব হয় না। অতএব, এই তড়িৎ বিন্দু-দ্বয় দ্বিধা হইলেই সৃষ্টি, আর একধা হইলেই প্রলয়। আরো বলা আবশ্যক, এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গবেষণায় এই পরস্পর সম্বন্ধ দুই প্রকার তড়িৎ বিন্দু ব্যতিত, অপর আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। আরো, 'অনুশাসিত তড়িৎ বিন্দু'র ক্রিয়া আছে, অতএব ইহার বিকাশ আছে; ইহা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, 'মৌলিক তড়িৎবিন্দু'র অস্তিত্ব আছে; ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়াও, কিন্তু ক্রিয়া বিহীন বলিয়া, তাহাকে প্রতীয়মান করা সম্ভবপর হয় না। সেটি কেবল জ্ঞানগম্য। এই তড়িৎ বিন্দুদ্বয়ের দ্বিধা প্রক্রিয়া যদি জগতের বিকাশের কারণ হয়, এবং তাহাদের উভয়ের মিলন যদি জগতের প্রলয়ের কারণ হয়, এই দুইটি যদি পরস্পর সম্বন্ধ থাকে—অথচ দ্বিধা থাকে—তাহা হইলে

জগত সৃষ্টির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া যায়, তবে একবার তান্ত্রিক শিবশক্তি সম্বন্ধে দুইএকটি কথা বলার অবসর হইল।

তাহা এই। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন যে, যখন শিব ও শক্তি পরস্পর মিলিত থাকেন,- অন্য কথায় মহেশ্বর এবং মহামায়া পূর্ণমিলনে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন কোন বিকাশই সম্ভব হয় না। কিন্তু, ইহার মধ্যে রহস্য এই যে, যদিও শিব শক্তি দ্বিধা হন, তথাপি উভয়েই সর্বদা সর্বস্থানে পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া জগতের নাম রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহারা মিলিত হইলেই প্রলয়, পরস্পর সম্বন্ধ থাকিয়া দ্বিধা হইলে, সৃষ্টি।

আমার বক্তব্য আরো পরিস্ফুট হইবে, মহামায়া কালীর—যাহাকে আমরা আদ্যাশক্তি বলি,—তাহার যে প্রতিমা পূজা করা হয়, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিচার করিলে। সেই আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি আপনারা সকলেই জানেন। সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়া অদ্যকার প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। প্রথমতঃ তিনি শব-রূপী শিবের বক্ষে নৃত্যময়ী হইয়া দণ্ডায়মানা, সেটায় এই বুঝিতে হইবে যে, শিব শব-রূপী, অর্থাৎ অক্রিয়। তিনি মহা কালরূপে একভাবে তুরীয়াবস্থ এবং সেইজন্য তাহাকে শায়িত দেখান হইতেছে। তাৎপর্য্য এই, তিনি একভাবে অনন্তকাল এক অবস্থায় আছেন। কিন্তু সৃষ্টি আরম্ভ হইলে, মহামায়া আদ্যাশক্তি, তাহা হইতে দ্বিধা হইলেও, তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইবার কোন ক্ষমতা নাই। তখনও মহামায়াকে শিব-বক্ষে দাড়াইয়া, শিবের সহিত সম্বন্ধ হইয়া সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে। তবে তিনি নৃত্যময়ী কেন? তিনি নৃত্যময়ী এই কারণে যে মহাকাশ প্রাণন ব্যতীত, কম্পন ব্যতীত,—অর্থাৎ মহাকাশকে আকুঞ্চিত না করিলে,—জগতের আধার-ভূত বস্তু সৃষ্টির সম্ভাবনা হয় না। Pulsation is life; গতিবিহীন হইলে, pulsation না থাকিলে, কোন বস্তু থাকিতে পারে না। তাহার মহামেঘ-প্রভা কালবরণ কেন? তিনি ব্রহ্মময়ী হইয়াও, তিনি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তির আধার হইয়াও, তিনি সৃষ্টির কারণ,—সৃষ্টির মাতা। যখন মাতা প্রসবিনী হন,—প্রসব করেন,—তখন তিনি তমঃগুণে আবৃত, তমঃগুণকে আমাদের শাস্ত্রে কাল রং দিয়া থাকে। তাঁহার চুল আলুলায়িত কেন? তাহার উদ্দেশ্য এই যে, মহাকাশের সকল দিক দিগন্তে তিনি শক্তি বিতরণ করিতেছেন এবং তাঁহারই শক্তিতে সকল বস্তু-নিচয় প্রাণিত ও অনুশাসিত হইতেছে এবং তাঁহার নিকট হইতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই শক্তি-ত্রয় আসিতেছে। তাহার ত্রি-নেত্র ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নির্দ্দেশ করে, অর্থাৎ তাঁহার নিকট কিছু ভূতও নয়, কিছু ভবিষ্যৎও নয়, কিছু বর্ত্তমান নয়, কোন প্রভেদ নাই, চির বর্ত্তমান (eternal now)। তাঁহার রক্তাক্ত মুখ ও জিহ্বা কেন? জগতে দেখা যায় যে, একটা প্রাণী প্রাণ না দিলে আর একটা প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হয় না। এই-ই জগতের নিয়ম। ইহা ছাড়া পুষ্টি হইবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু মা তো জগন্ময়ী, তিনি ছাড়া তো জগতে কিছু নাই, সেই জন্য তিনি দেখাইতেছেন যে, জগতের পোষণের জন্য, তিনি নিজের রক্ত নিজেই পান করিতেছেন। তিনি খড়্গ-মুণ্ড-বরাভয় ধারিনী কেন? সেটা এই জন্য—তিনি সকল জীবকে দেখাইতে-ছেন যে তাঁহার জগতের নিয়ম, ধর্ম্ম (law) যদি অবহেলা কর, এই খড়্গে তোমার মস্তক ছিন্ন করিব এবং সেই ছিন্ন মস্তক এই ভাবে ধারণ করিয়া সকলকে দেখাইব যে আমার অনু-

শাসনের বাধায় ফল কি। কিন্তু মা স্নেহময়ী, রসময়ী (love itself), অতএব তিনি বলিতেছেন, — 'বৎস, তুমি ধর্ম্মাচরণ কর, আমার নিয়মে শাসিত হও, তাহাতে তোমার পরম মঙ্গল, এবং আমার নিয়মে অনুচালিত হইয়া ক্রিয়া করিলে তোমার অপ্রাপ্য কিছু নাই, তোমায় আমি সব দিতে প্রস্তুত, তোমাকে আমি ব্রহ্মাণ্ড দিতে প্রস্তুত এবং তুমি আমার শক্তিতে শক্তিমান হইলে, তোমার কোন প্রকার ভয় নাই। তোমার কে ভয়দাতা, যে আমার শক্তির বিরুদ্ধে সে তোমার বিপদদায়ক হইতে পারে।' মহামায়ার মুণ্ড-মালা গলায় কেন? ঐ মুণ্ডমালাটা আমাদের পঞ্চাশৎ মাতৃকা, সংস্কৃত-শাস্ত্রের বর্ণমালা। এই বর্ণমালার, এই শব্দশক্তির দ্বারা মহামায়া নাম-রূপের সৃষ্টি করেন।

শ্রীব্যোমকেশ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী।

- -

পধ্বংক।

(১)

কল্কি অবতার, ইউরোপে বলশেবিক মূর্ত্তিতে কাল অবতার দেখা দিয়াছেন। তিনি একাকার করিতে চান, রাজায় প্রজায়, ধনী দরিদ্রে, কুলীন অকুলীনে ভেদ ভাঙ্গিয়া সকলকে এক অবস্থায় ফেলিতে চান। বহুদিন পূর্ব্বে কল্কির আবির্ভাবের সূচনা হইয়াছিল, ঠাকুরের অগ্রবর্ত্তী চরেরা দেশে দেশে একাকারের উপকারিতা বুঝাইতেছিলেন, ও ঘোঁট করিয়া আপনাদের দল বাঁধিতেছিলেন, কিন্তু খাঁটি যুদ্ধ বিগ্রহ বাধে নাই। যাহাতে একদিকে রাজ শক্তির প্রভাবে পিষিয়া মরিতে না হয়, ও অন্য দিকে দলপতির হুকুম মানাইয়া লোকদিগকে একটা বাঁধা জমাট-দলে পরিণত করা যায়, কল্কির চরেরা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদিকে ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, দলের লোকেরা রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না, অথচ রাজার আজ্ঞাও পালন করিবে না। সম্পূর্ণরূপে রাজাশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য থাকিয়া, ঐ শাসনের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দিবে। অন্যদিকে দলের লোকদিগকে দলপতির আদেশ মানিতে অভ্যস্ত করিবার জন্য এই কৌশল করা হইয়াছিল যে, প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনে, দলপতি মধ্যে মধ্যে একটা আদেশ প্রচার করিবেন, ও দলের লোকেরা তাহার সার্থকতা না বুঝিয়াই, আদেশ পালন করিতে থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে কখনও বা দলের লোকদিগকে উপবাস করিতে ও কখনও বা কাজ-কর্ম্ম ও দোকান-পাট বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইত। ধর্ম্মঘট করাইয়া কখনও কখনও বা শ্রমজীবিদিগকে মুনিবের শাসন ও খাতির অগ্রাহ্য করিতে শিখান হইত। ইউরোপে, লোক সাধারণের পক্ষে, স্বাধীন-পন্থায় চলিলে কঠোর দণ্ড-বিধির ভয় নাই, তবুও, প্রায় একশত বৎসরের পরীক্ষায়, কল্কির চরেরা বুঝিতে পারিলেন, নির্বিরোধী হইয়া আড়ি করিয়া চলিলে রাজ্যশাসনকে দুর্ব্বল করা যায় না, দুই একটা ছোট খাট বিষয়ে ফল-লাভ হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয় না, এবারে বলশেবিক-রূপী কল্কি, আড়ি ছাড়িয়া যুদ্ধে, নামিয়াছেন।

কল্কিঠাকুর ধর্ম্মক্ষেত্রে গুরু-পুরোহিতের শাসন উড়াইতেছেন, সমাজে ধনীর গৌরব ধ্বংস করিতেছেন ও অরাজকতা আনিয়া ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতির সূচনা করিতে চেষ্টা করিতে চান।

গোলামি-বুদ্ধি (slave mentality) সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া, ইঁহারা সকল রকমের কর্ত্তাগিরি উড়াইবেন, বলিতেছেন। একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যাঁহারা চির-সঞ্চিত গোলামি-বুদ্ধি উড়াইতে চাহেন, তাঁহারা নিজে পরের স্বাধীন মতের প্রতি যেরূপ অসহিষ্ণু, ও যেরূপ জোর-জুলুমে পরের টুঁটি টিপিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন, তেমনটা প্রাচীন গোলামি-বুদ্ধিতে ছিল না। প্রাচীন গোলামি-বুদ্ধির রাজনীতির উদারতায়, কর্ত্তার চরেরা যেরূপ ঘোঁট করিতে ও ধর্ম্মঘট করিতে পারিয়াছেন, কর্ত্তার প্রভাব বাড়িলে, কোন লোক নিজের স্বাধীন-বুদ্ধি বজায় রাখিয়া তাহার শতাংশের এক অংশও করিতে পারিবেন না। যাহাই হোক, ইউরোপে কল্কির দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষের কল্কিঠাকুর কবে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবেন, তাহা আমাদের নূতন পাঁজিতে খুঁজিয়া পাইলাম না। পাঠকেরা কোন খবর রাখেন কি ?

(২)

উপাধির বালাই।—এ দেশের মোক্ষ শাস্ত্রে লেখে যে, নিরুপাধি না হইলে মুক্তি-লাভ হয় না। আমরা সে উপাধির কথা বলিতেছি না, রাজদত্ত উপাধির কথা বলিব। এ কালের আড়ির দলের নেতাদের যে কয়েকটি কথার সহিত আমার মিল আছে, তাহার মধ্যে একটি এই যে, উপাধির বালাই যতই দূর হয়, ততই দেশের মঙ্গল। এই বালাই নাই বলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মেকি দেশহিতৈষী বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। যিনি দেশের অগ্রণী ও নেতা, তাঁহার নাম করিতেও কিছু বিশেষণ জুড়িতে হয় না,—তিনি দেশের অতি সাধারণ লোকের মত 'মিষ্টার অমুক' মাত্র। কাহার মাহাত্ম্য আছে বা নাই, তাহার পরিচয় কাজে ; বিশেষণ জুড়িলে গুণ বাড়ে না। আশ্চর্য্য এই, এদেশে যাহারা উপাধির উপর চটা, তাহারাই তাঁহাদের নেতাদিগকে সাদা নামে অভিহিত করিলে ধৈর্য্য হারাইয়া থাকেন।

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি আমাদের রাজ-সরকার ব্যবস্থা করেন যে, যাহারা মিউনিসিপালিটিগুলিতে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা ঐ পদের সূত্রে বেসরকারী অন্য লোকের অপেক্ষা কোন বিশেষ সম্মান পাইবেন না ও তাঁহারা কাজে শত নাম করিলেও, কোন উপাধি পাইবেন না, তাহা হইলে যাহারা মান বাড়াইবার লোভে, খাটি কাজের লোককে ঠেলিয়া ভোট কুড়াইয়া কর্ত্তাগিরি করিতে ছোটেন, তাহারা আর দেশহিতৈষণার ছল করিবেন না। আর যাঁহারা যথার্থ কাজের লোক, তাঁহারাই প্রাণের টানে কাজ করিতে জুটিবে। ক্ষমতা চালাইবার প্রলোভনও একটা বড় প্রলোভন বটে, তবে মনের গোড়ায় উপাধির ছাই না পড়িলে, অনেক দোষ দূর হইবে।

আড়ির দলের লোকেরা সাবধান হউন, তাঁহারা যেন নেতাদের নামে বিশেষণ জুড়িবার বাতিক ছাড়েন, ও কোন নেতাকেই অবতার করিয়া খাড়া করিয়া দেশের গোলামি-বুদ্ধিকে হাজার গুণে বাড়াইয়া না তুলেন।

(৩)

অপবিত্র অর্থ।—আমার "আড়ি" প্রবন্ধের সমালোচক অরবিন্দ বাবু লিখিয়াছিলেন যে, রাজ-সরকারের তহবিলের টাকা আমাদের দেওয়া টাকা হইলেও, এ টাকা রাজা ছুঁইয়াছেন বলিয়া, উহা অসতী স্ত্রীলোকের মত অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইয়াছে, সেইজন্য ঐ টাকায় যে সকল

শিক্ষাশালা গড়িয়াছে, সেখানে কাহারও যাওয়া উচিত না। রাজ-সরকার ত আমাদের টাকাতেই দেশের রাস্তা তৈরি করিয়াছেন, সে রাস্তাগুলিতেও তাহা হইলে চলা ফেরা বন্ধ করিয়া চাঁদা তুলিয়া নূতন রাস্তা গড়িতে হয়। দেশটাকে ও যে রাজ সরকার আপনাদের অধীনে আনিয়াছেন ও উহার উন্নতির হউক বা অধোগতির হউক, সকল ব্যবস্থা করিতেছেন, এই অপবিত্র দেশ ছাড়িয়া নূতন উপনিবেশ খুঁজিতে হইবে কি? অন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। দুশ্চরিত্র চোর-ডাকাতেরা যাহা আত্মসাৎ করে, তাহা ফিরাইয়া পাইলে যদি ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়, তবে কেহ আর চোর ধরিতে বড় আগ্রহ করিবে না। চোরেরা সুখে ব্যবসা চালাইতে পারিবে।

রাজ-সরকারের হাতে যে টাকা পড়ে, তাহা যে অস্পৃশ্য বা "হারাম" হয়, একথা গুজরাট প্রদেশের আঁধির দলের লোকের মুখেও শুনিয়াছি। কাজেই অরবিন্দ বাবুর "অসতের টাকা" কথাটা তাঁহার মন-গড়া নয়।

(৪)

স্বরাজ।—আঁধির দলের নেতারা বলেন যে, স্বরাজের প্রকৃতি কি হইবে তাহা এখন বলা চলে না। কিন্তু তাহাদের মনে একথা ঠিক যে, যত দিন মানুষ গোলামি-বুদ্ধিতে অপরের পা'চাটিতে থাকিবে, ততদিন স্বরাজ দেখা দিবে না। তবে কথা এই, লোকে যদি সাদা পা ছাড়িয়া, কাল পা চাটিতে আরম্ভ করে, তবে কি তাহাদের গোলামি-বুদ্ধি গিয়াছে বুঝিব? যাহারা অজানা আতঙ্কে ও চির-পুষ্ট গোলামি-বুদ্ধিতে জুজুর ভয়ে কাজ করে, কিন্তু কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনায় কাজ করে না, তাহারা যদি এক জুজুর পরিবর্ত্তে অপর এক জুজু বা অবতারের পা'চাটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ত তাজা গোলামি বুদ্ধি বাঁচিয়াই রহিল। জুজুর পরে জুজু খাড়া করিয়া, মানুষের পা'চাটার প্রবৃত্তি প্রবল রাখিয়া, গোলামি বুদ্ধি তাড়াইবার উদ্যোগটি কি উপহাসের জিনিষ নয়? স্বরাজের প্রকৃতি বুঝিবার দিন হয় ত আসে নাই কিন্তু এই বিকৃতে যাহা জন্মিবে, তাহা স্বরাজ নয়,—তাহা ক্ষণস্থায়ী কল্কির ভেল্কি।

(৫)

নূতন দুর্দৈব।—কেবল চিত্তরঞ্জন কথায় লোকের পেট ভরিবে কি না সন্দেহ করিয়া, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যবস্থা করিতেছেন,—যাহারা অধিক লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না, তাহারাও কিছু উপার্জ্জন করিবার পথ পায়। এ ব্যবস্থায় একদল লোক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, দেখিতেছি। কারণ এই যে, ইহাতে তাঁহাদের কণ্ঠ-স্বরের কুস্তি করিবার আসর সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। যাহাদের লইয়া নাচ গান, তাহারা পেটের ভাবনা ভাবিলে চলিবে কেন? অতিবুদ্ধি থাকিলে যখন ক্ষুদ্র লুঙ্গিতেও দড়ি বাঁধিয়া কাছা করা চলে, তখন বুদ্ধিমানেরা আসর জাঁকাইবার নূতন উপায় আবিষ্কার করুন, নূতন উপায়ে এলম্-খানাকে গোলাম-খানা বলিয়া প্রতিপন্ন করুন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পরপুষ্ট জীব।

[Parasites]

সংজ্ঞা। যাহারা অপর জীবের দেহ হইতে স্বীয় আহার সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে পরপুষ্ট বলা যায়। কিন্তু প্রায় সকল জীবই ত অপর জীবের দেহ হইতে নিজ আহার গ্রহণ করে। আমরাও গাছপালা জীবজন্তু খাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরপুষ্ট সংজ্ঞা আরও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যে জীব অপর জীবিত প্রাণীর দেহকে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী রূপে আশ্রয় করিয়া, তাহার দেহ হইতে স্বীয় আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করে ও তাহার অনিষ্ট সাধন করে, তাহাকেই আমরা এস্থলে পরপুষ্ট বলিব। পরপুষ্ট জীব উদ্ভিদও হইতে পারে, জন্তুও হইতে পারে। সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া আহার সংগ্রহ করে, সেও উভয় শ্রেণীরই হইতে পারে। পরপুষ্টেরা যেমন আশ্রয়ের অনিষ্ট সাধন করে তেমনই নিজেরও অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা চিরজীবন অপরের দেহে বাস করে, তাহাদিগের নিজেরও অবশেষে গুরুতর অনিষ্ট হয়। ইহাদিগকে স্থায়ী-পরপুষ্ট বলিব। আর, যাহারা জীবনের কিয়দংশমাত্র অপরের দেহ হইতে আহার সংগ্রহ করে এবং অবশিষ্ট অংশ স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের তাদৃশ অনিষ্ট না হইলেও, ন্যূনাধিক অনিষ্ট প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। ইহাদিগকে অস্থায়ী-পরপুষ্ট বলা যায়।

আবাস। পরপুষ্টেরা, উদ্ভিদই হউক জন্তুই হউক, আশ্রয়দাতার দেহ মধ্যেও থাকে, দেহের বহিরাবরণেও থাকে। কৃমি আমাদিগের দেহমধ্যে বাস করে, কিন্তু উকুন দেহের বাহিরের ত্বকে সংলগ্ন থাকে। কোন কোন পরপুষ্ট জীব প্রথমতঃ স্বাধীন ভাবে থাকিয়া, পরে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে এক অথবা ততোধিক প্রাণীর দেহে আশ্রয় লইয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দেয়, এই স্থানেই ইহারা বংশবৃদ্ধিও করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ম্যালেরিয়ার কীটা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা ডিম্বাবস্থায় স্বাধীন জীবন যাপন করিয়া, কিঞ্চিৎ বয়স হইলে, মশক বিশেষের দেহমধ্যে আশ্রয় লয়, সেখানে কিছুদিন কাটাইয়া, মশক-দষ্ট মানুষের দেহে প্রবেশ করে ও তথায় বংশবৃদ্ধি করে। অন্য পরপুষ্ট জীব হয়ত প্রথম বয়স অথবা মধ্যবয়স পর্য্যন্তও অন্যের আশ্রয় লইয়া পরে স্বাধীন জীবন যাপন করে। পাচড়ার কীট যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর একপ্রকার পরপুষ্টেরা (১) মধ্যবয়সে পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে। আর একপ্রকার পরপুষ্ট জীব আছে তাহারা কখনই স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে না। ফিতার মত কৃমি চির-জীবনই পরপুষ্ট। অন্য কৃমিও প্রায় তদ্রূপই। পরপুষ্ট অবস্থার স্থায়ীত্বের ঈদৃশ প্রভেদ বশতঃ, স্থায়ী অস্থায়ী (২) —এই দুই ভাগে পরপুষ্ট জীব সকলকে বিভক্ত করা হয়।

যাহারা পরপুষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের স্ব-গণস্থ (৩) কিম্বা স্ব-জাতীয় (৪) অন্যজীব

(১) Pycnogonids.

(২) অস্থায়ী অর্থে জীবিতকালের ভগ্নাংশ বুঝিতে হইবে।

(৩) Genus. (৪) Species.

স্বাধীন থাকিতে পারে। এক প্রকার জীবও (৫) কেহ পরপুষ্ট, কেহ স্বাধীন আছে। এক-জীবও কোন দেশে স্বাধীন, অন্য দেশে পরপুষ্ট আছে। বয়স ভেদেও স্বাধীন অথবা পরপুষ্ট অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা বলিয়াছি।

হেতু। পরপুষ্ট অবস্থা উপরোক্ত নানা কারণে উৎপন্ন হওয়াই বিবেচনা করিতে হয়। এক জীব অকস্মাৎ অন্য জীবকে খাইয়া ফেলা কিছুই অসম্ভব নহে, ইহা ইচ্ছা-পূর্ব্বক হউক অথবা অজ্ঞাতে হউক, সর্ব্বদাই হইতেছে। তেমনই, একজীব দৈবাৎ অন্যজীবের দেহের সংলগ্ন হওয়া, কিম্বা সেই আবরণ ছিন্ন অথবা খণ্ডিত থাকিলে, দেহমধ্যে প্রবেশ-লাভ করাও কিছুই অসম্ভব নহে। যদি এইরূপ ঘটে এবং তাহাতে ঐ জীব সাময়িক উপকার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ খাদ্যের এবং বাসস্থানের সুবিধা বোধ করে, কিম্বা নিজকে নিরাপদ মনে করে, তবে ঐ আকস্মিক ঘটনা হইতেই একটা স্থায়ী অথবা অস্থায়ী অভ্যাস জন্মিতে পারে। ইহা হইতেই ঐ জীব পরপুষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহার দেহে আশ্রয় লয়, তাহার দেহের সকল স্থান ঐ জীবের পক্ষে সমান সুবিধাজনক হওয়া অসম্ভব। স্থান বিশেষ উহার পক্ষে অধিক উপযোগী হইতে পারে। এ নিমিত্ত দেখা যায় কোনও পরপুষ্ট জীব আশ্রয়দাতার দেহের একস্থানে, অন্যে অপর স্থানে বাস করে।

পীড়া। পরপুষ্ট জীব যে জীবের দেহে আশ্রয় লয়, তাহাতে নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করিতে পারে, অবশেষে তাহার জীবন নষ্টও করিতে সমর্থ হয়। উদ্ভিদশ্রেণীর পরপুষ্ট জীবের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কোষ (৬ পূয়ঃ, সেপ্টিসিমিয়া, এরিসিপিলাস, গণোরিয়া, কলেরা, টাইফএড্ জ্বর, প্লেগ, নিওমোনিয়া, ইনফ্লুএনজা, ডিপ্থিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। জন্তুশ্রেণীর পরপুষ্ট জীবেরও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কোষ (৭) ম্যালেরিয়া, আমাশয়, উপদংশ, কালাজ্বর প্রভৃতি পীড়া জন্মাইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত। পরপুষ্টগণ যে সকল শ্রেণীর উদ্ভিদ ও জন্তু মধ্যে অধিক দেখা যায়, তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এ স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটামাত্র উল্লেখ করিতেছি। জন্তুগণকে যদি মেরুদণ্ড-যুক্ত এবং মেরুদণ্ড হীন, এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে দেখা যায় যে মেরুদণ্ড-যুক্ত জন্তুগণ প্রায় কেহই প্রকৃত পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করে না। উহারা আপন চেষ্টাতেই আহার সংগ্রহ করে, মেরুদণ্ড-যুক্ত জীবমধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত, অর্থাৎ মৎস্য, তাহাদিগের মধ্যে অতিক্ষুদ্র তিনচারি প্রকার মৎস্য পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একপ্রকার মৎস্য (৮) আছে, তাহারা মূত্রের গন্ধে আকৃষ্ট হয়, এবং যাহারা স্নান করিতে জলে নামিয়া প্রস্রাব করে, তাহাদিগের মূত্রনালির মধ্যে প্রবেশ করে। একবার প্রবেশ করিলে আর ঐ ক্ষুদ্র মৎস্যকে বাহির করা যায় না। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ব্রেজিলে ছিদ্রযুক্ত নারিকেলের খোল দ্বারা মূত্রদ্বার আবৃত করিয়া লোকে অবগাহন স্নান করিয়া থাকে (৯)। স্নান করিতে নামিয়া, জলে প্রস্রাব করা নানা কারণেই অসঙ্গত।

---

(৫) Varieties (৬) Bacteria, (৭) Microbe. (৮) Vandellia Cirrhosa.
(৯) Encyclopedia Brittannica, 11th Ed, Vol. 20, p 794.

মেরুদণ্ডহীন জন্তুগণ মধ্যে শম্বুক শ্রেণীতে প্রকৃত পরপুষ্ট প্রায় নাই বলিলেই হয়। উকুন, খোস-পাঁচড়ার পোকা, ফলের পোকা প্রভৃতি বহু সংখ্যক প্রাণী পরপুষ্ট। কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি কঠিন-আবরণ-যুক্ত প্রাণী মধ্যে অনেক পরপুষ্ট দেখা যায়। বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পরপুষ্ট প্রাণী, কীট শ্রেণী মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা ডিম্বাবস্থায় আশ্রয় দাতার দেহের মধ্যে বাস করে, পূর্ণ বয়সে তাহার দেহের বহিরাবরণে সংযুক্ত হয়। এই শ্রেণী মধ্যে নানাপ্রকার পরপুষ্টাবস্থা দেখা যায়। পিপীলিকারা তাহাদিগের বাসায় অন্য কীট (১০) পোষে এবং সেই কীটের দেহে শুঁড় দিয়া নাড়িতে নাড়িতে একপ্রকার মিষ্ট তরল রস বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। আমরা যেমন গরু পুষিয়া দুগ্ধ খাই, সেইরূপ। এস্থলে পিপীলিকাকে পরপুষ্ট বলা যায় না, অথচ যে কীটের রস খায়, তাহাকে গৃহপালিত-বৎ করিয়া তুলে। পরপুষ্ট অবস্থার যে সকল কুফল পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে, তাহা ঐ পিপীলিকা পালিত কীটের (এবং পিপীলিকারও) অনেক পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহা পরে দেখাইব। জোঁক আংশিক ভাবে পরপুষ্ট। ফিতার মত কৃমি সকলেই পরপুষ্ট, ইহারা কেহই স্বাধীন জীবনযাপন করে না, ইহারা আশ্রয়-দাতার দেহমধ্যে বাস করে। কিন্তু গোল কৃমিসকলের মধ্যে পরপুষ্টও আছে, স্বাধীনও আছে। অত্যন্ত অনুন্নত প্রাণীগণ মধ্যে প্রায় প্রথম স্তরের জীব, এমিবা। ইহারা অনেকে পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করে। ইহারা কেহ কেহ আমাশয় পীড়া উৎপাদন করে।

উদ্ভিদগণের মধ্যে অনেকে পরপুষ্ট। ব্যাকটেরিয়া (অর্থাৎ উদ্ভিদাণু) নানাপ্রকার পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে। ইহাদিগের অধিকাংশই জীবনের কোন না কোন অংশ পরপুষ্টাবস্থায় কাটাইয়া দেয়। ব্যাঙের ছাতার (১১) দেহে সবুজ পদার্থ নাই। উদ্ভিদ-পত্রের সবুজ পদার্থই, সূর্য্যকিরণের সাহায্যে, বায়ু হইতে অঙ্গার-পদার্থ সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদের দেহ গড়িয়া তুলে। ঐ সবুজ পদার্থ (১২) ব্যাঙের ছাতায় নাই। সুতরাং উহার দেহ-গঠন কার্য্যে যে কিঞ্চিৎ অঙ্গার আবশ্যক হয়, তাহা অন্য মৃত অথবা জীবিত প্রাণী হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। এই নিমিত্ত পচা জৈবিক পদার্থ হইতে অথবা জীবিত প্রাণীর দেহ হইতে ব্যাঙের ছাতারা অঙ্গার গ্রহণ করে। সুতরাং উহাদিগকে পচাপুষ্ট অথবা পরপুষ্ট অবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ইহারা নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করে। লতাগাছ ও গুঁড়ি বিশিষ্ট গাছের মধ্যেও অনেক পরপুষ্ট আছে। হলদি, (১৩) আলগুছি লুটা, কল্‌মি, ভুঁই-কুমড়া, দুধ-কুমড়া, ইত্যাদি বহু লতা সময় সময় পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে। ইহাদিগের কাহারও২ সামান্যমাত্র গুঁড়ি আছে, কাহারও নাই। সংস্কৃতে যাহাকে "আকাশবল্লী" গাছ বলে তাহারা সকলেই পরপুষ্ট। এই গাছ চিনিতে পারি নাই। কিন্তু বটবৃক্ষাদির ন্যায় বড় গাছ পরপুষ্ট হইতে প্রায় দেখা যায় না, তথাপি কখন ২ বড় গাছও অন্য বড় গাছের উপর জন্মে, তখন ইহারাও পরপুষ্ট হয়। আম গাছে, ডালিম গাছে সর্ব্বদাই পরপুষ্ট "আলোকলতা" দেখা যায়। খেজুর গাছের উপর পরপুষ্ট অবস্থাপন্ন বটগাছ অনেক দেখা যায়।

উদ্ভিদ ও জন্তুগণের মধ্যে কতিপয় পরপুষ্টের উল্লেখ করিলাম।

---

(১০) Aphides, ইত্যাদি।　　(১১) Fungus, কোন কোন প্রদেশে কুকুর ছাতা বলে।
(১২) Chlorophyll.　　(১৩) কোন কোন স্থানে হলদে বলে।

কুফল। এক্ষণে এই অবস্থার কুফলসকল উল্লেখের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কুফল দুইদিক হইতেই বিবেচনা করা যায়। যে পরপুষ্ট তাহারও অবনতি হয় এবং পরপুষ্টেরা যাহার দেহে আশ্রয় লয়, তাহাকেও অবনত করে, কখন বা মারিয়াও ফেলে। প্রথমতঃ, আশ্রয়দাতার কথাই বিবেচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, আশ্রয়দাতার দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে পরপুষ্টগণ, (উদ্ভিদই হউক, জন্তুই হউক,) বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। তাহার দেহ আহার অভাবে শক্তিহীন ও দুর্ব্বল হইলেই, উহারা অধিক অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়, নচেৎ বিশেষ কিছু করিতে পারে না (১৪)। আমাদিগের প্রত্যেকের দেহেই পীড়াদায়ক পরপুষ্ট জীবাণু প্রবেশ ও বাস করে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত রক্তের জোর থাকে, সে পর্য্যন্ত বড় অনিষ্ট করিতে পারে না। রক্তের জোর বলিতে, উহার মধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ রক্তকীটদিগের শক্তি বুঝিতে হইবে। পীড়াদায়ক জীবাণু, দেহে প্রবেশ করিলেই, ঐ সকল রক্ত-কীট (phagocytes) তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। পরপুষ্ট জীবাণুগণের ও তাহাদিগের বংশীয়গণের সহিত রক্তকীটগণের যুদ্ধ হইয়া, যে পক্ষ জয়ী হয়, তদনুসারে ফলও হয়। রক্তকীটগণ জয়ী হইলে, পরপুষ্টগণ কিছুই করিতে পারে না, তাহারা পরাজিত হইলে, পীড়াদায়ক পরপুষ্ট জীবাণুগণই আশ্রয়দাতার দেহাভ্যন্তর ছাইয়া ফেলে এবং নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। কখন কখন ইহারা অসংখ্য দলে আশ্রয়দাতার দেহের অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রসকলকে আক্রমণ করিয়া, এত পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে যে, তাহার জীবন শেষ হইয়া যায়। আশ্রয়দাতার দেহের রসভাগে ও ধাতুতে যদি একপ্রকার দোষ থাকে, যাহাতে পরপুষ্টগণের দেহপোষণ হয়, তবে উহারা সেই খাদ্যের লোভে, তাহার দেহে প্রবেশ করে, এবং তাহার রক্তের জোর না থাকিলে, বিপন্ন করিয়া তুলে, পরিশেষে, তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে।

উপরে যে পিপীলিকা এবং তৎপালিত কীটের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে স্মরণ করুণ। এস্থলে পিপীলিকাকেই পরপুষ্ট বলা যাইতে পারে। কিন্তু পিপীলিকাই প্রভু। তাহার দাস পিপীলিকা (১৫) আছে। সে পালিত কীটের দেহে শুড় দ্বারা স্পর্শ করিতে করিতে, দেহ হইতে যে মিষ্ট জলীয় পদার্থ ক্ষরিত করে, তাহা প্রভু-পিপীলিকাকে খাওয়ায়। প্রভু এইরূপ পরিচর্য্যা পাইতে পাইতে এতদূর অলস ও জড়বৎ হইয়া যায় যে, দাস তাহাকে না খাওয়াইয়া দিলে, সে অনাহারে মারা যাইবে, তথাপি স্ব-চেষ্টায় আহার করিবে না। তাহার এই দশা কেবল পালিত কীটের রস সম্বন্ধেই হয়, এমত নহে, প্রভু পিপীলিকার সর্ব্বপ্রকার আহারই, দাস পিপীলিকা দ্বারা প্রদত্ত হওয়ায়, সে আর স্ব বশে কোন আহারই লইতে পারে না(১৬)। পক্ষান্তরে,

(১৪) A plant or animal in perfect health is more resistant to parasitic invasion than one which is ill-nourished and weakly —Ency Brit., 11th Ed., Vol 20, p. 924.

(১৫) Slave ant

(১৬) Notwithstanding the fact that the food was easy of access .. they (the red slave owner ants) would not touch it I then placed a black slave in the jar. She at once went to her masters ... and gave them food. These red ants would

পালিত কীটের দেহ হইতে রস ক্ষরিত হইতে হইতে, সে ক্রমে এত দুর্ব্বল অঙ্গহীন ও রসহীন হইয়া যাইতে পারে যে, তাহার শেষ-দশা উপস্থিত হয়। যে সকল জীব প্রকৃত পরপুষ্ট অবস্থায় অন্য জীবের দেহ মধ্যে অথবা দেহের বহিরাবরণে বাস করিয়া তাহার দেহ হইতে স্ব স্ব আহার্য্য পদার্থ সংগ্রহ করে, তাহারাও স্ব-চেষ্টায় অনভ্যস্ত হইয়া যায়। তাহাদিগের জীবিকার নিমিত্ত নিজের কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। কর্ম্ম না করিতে করিতে দেহের অঙ্গসকল জড় ও ও ক্ষীণ ও কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীবতত্ত্বের ইহা একটা প্রধান নিয়ম যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াহীন হইয়া যায়, তাহারা অবসন্ন হইতে হইতে বিলুপ্ত হয়। পরপুষ্টের পাকস্থলী ক্রিয়া করিয়া খাদ্যবস্তুকে শরীর-পোষক রসরক্তে পরিণত করে না, আশ্রয়দাতার দেহ হইতে প্রস্তুত রসরক্ত প্রাপ্ত হয়। এই হেতু, উহার পাকস্থলী নিষ্ক্রিয় হইতে হইতে বিনষ্ট হইয়া যায়। উহার পদাদি স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া উহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া খাদ্য সংগ্রহ করায় না; সুতরাং হস্ত পদাদিও ক্রমে লুপ্ত হয়। উহার চোয়ালকে কর্ম্ম করিতে হয় না সুতরাং চোয়ালও লুপ্ত হয়। অবশেষে জননেন্দ্রিয়ও বিনষ্ট হইয়া যায়। উহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, অঙ্গ বহুল পরপুষ্টও একটীমাত্র কোষে পরিণত হইতে পারে (১৭)। পরপুষ্ট, আশ্রয়দাতার দেহে বাস করিতে করিতে তাহার ধাতু ঐ একটীমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমঞ্জস হইয়া উঠে। যে জীব যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহা সহ্য হইয়া গেলে, সে ঐ অবস্থারই উপযোগী হয়; অন্য অবস্থায় বাস করা এবং জীবিত থাকা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। যদি সে অন্য অবস্থায় উপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল, তবে বাঁচিল; নচেৎ নানারূপে অবসন্ন হইতে হইতে মরিয়া গেল। এই নিয়মের বশে, পরপুষ্ট ক্রমে তাহার আশ্রয়দাতার ধাতুরই উপযোগী হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্রয়দাতাকে সে নানা ভাবে পীড়িত ও জীর্ণ করিয়া ফেলে, হয়ত বিনষ্ট করে। সুতরাং সে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উপযোগী হয়, তাহা সে নিজেই পরিবর্ত্তিত ও নষ্ট করে। এই হেতু সে (অন্য অবস্থায় অনুপযোগী বিধায়) স্বয়ংই মারা যায় (১৮)। সে যদিবা কোনক্রমে জীবিত থাকে, তাহা হইলেও তাহার বংশধরগণ বিনষ্ট হইতে পারে। এই কারণবশতঃ, তাহার অত্যন্ত অধিক বংশবৃদ্ধি না হইলে, দুই চারিটীও জীবিত থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। যদি অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি হয়, তবে উহারা নির্ম্মূল হয় না, নচেৎ নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিলোপ হেতু, পরপুষ্টগণ দুর্ব্বল, অবসন্ন এবং অনুন্নত হইবেই।

---

have starved to death in the midst of plenty, if they had been left to themselves.—Weir's Dawn of Reason, p. 155.

(১৭) If the parasitic life be once secured, away go legs, jaws, eyes and ears, the active highly gifted crab, insect or annilid may become mere sac.—Ray Lankester's Degeneration, p. 33.

(১৮) A creature regidly adapted to a special enviroment fails, if it does not reach that environment ... High reproductive capacity is ... urgent when the parasites tend to bring to an end their own environment by killing their host.

—Ency. Brit: 11th Ed., vol. 20, p. 796.

মানব। সকল আলোচনাই মানব সমাজের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে, সার্থক, নচেৎ, নিষ্ফল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মানব ত চিরদিন পরপুষ্টভাবে থাকে না। সে যে কাল মাতৃগর্ভে থাকে, সেই কালই পরপুষ্ট অবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সে আর অন্য প্রাণীর দেহের মধ্যেও বাস করে না, বহিরাবরণেও সক্ত হয় না। সেভাবে সে আহার সংগ্রহ করে না। অধিকাংশ মানবই স্বচেষ্টায় আহার সংগ্রহ করে। ভিক্ষুক অথবা নিতান্ত নিঃস্ব অন্নদাস ব্যতীত অপরে স্বচেষ্টা দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করে। সুতরাং মানবের পরপুষ্ট অবস্থা উপরের বর্ণিত প্রভু-পিপীলিকা ও দাস-পিপীলিকার সহিত তুলনীয়, কৃমি অথবা উকুনের সহিত নহে। কিন্তু যে ভাবের পরপুষ্টাবস্থাই হউক, উহার কুফলসকল, কর্ম্মের অভাববশতঃ উৎপন্ন হয়, চেষ্টার অভাব বশতঃ যে জড়ত্ব উপস্থিত হয় তাহা হইতেই জাত হয়। কর্ম্ম আমাদিগের সহজাত অনুষ্ঠান কর্ম্ম প্রবৃত্তি সহজাত প্রবৃত্তি। (১৯) সুতরাং মানব যতই কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে বাধ্য হয়, ততই তাহার দেহ অবসন্ন, পীড়িত ও বিলুপ্ত হয়। সহজাত বৃত্তির অননুষ্ঠান প্রায় সর্ব্বদাই অমঙ্গলজনক হয়। আহার সংগ্রহের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় যে সকল কর্ম্ম, তাহা প্রতিহত হইলে, অথবা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অবসর কিম্বা সুযোগ না থাকিলে, দেহ ও মন অবসন্ন হয়, ইতর জীবেরও হয়, মানবেরও হয়। যখন কোন মানব অথবা মানব-সমাজ অপর মানব কিম্বা মানব সমাজের প্রভু হয় এবং তাহার হস্ত হইতে প্রায় সকল কর্ম্মই কাড়িয়া লয়, অথবা যখন প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম স্বাধীনভাবে করিবার সুবিধা অপহৃত হয়, কিম্বা যখন আহার-সংগ্রহ-কর্ম্মের প্রভু নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত, স্বাধীন চেষ্টার ও পথ আর থাকে না, অথবা হ্রাস হইয়া যায়,—তখন অধীন-মানব অথবা মানব-সমাজ পরপুষ্টাবস্থার সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। স্বাধীন কর্ম্মে, নিজের প্রয়োজনীয় কর্ম্মে চেষ্টিত হইলে, মানবের উদ্ভাবনী শক্তি মার্জ্জিত ও উন্নত হয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা উদ্বুদ্ধ হয়, সফলতায় নির্ম্মল আনন্দ সঞ্জাত হয়। পরকর্ম্ম সফল হইলেও, এ সকল বৃত্তি ও আনন্দ তাদৃশভাবে উৎপন্ন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত, অধীন-ভাব, দাস ভাব, মানব এবং মানব সমাজের এত অনিষ্টজনক। ইহাতে কর্ম্মবৃত্তি প্রতিরুদ্ধ হইবেই, এবং তাহার ফলে জড়ত্ব আনয়ন করিবেই। (২০) বরং ইতর জীব অপেক্ষা, মানবে পরপুষ্টাবস্থায় কুফল, পরবশতায় শোচনীয় পরিণাম অধিকতর দ্রুতগতিতে উৎপন্ন হয়। ইতর জীবসম্বন্ধে পরপুষ্টাবস্থা, গৃহপালিত অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, মানবের ক্ষেত্রে পরবশতা—নানাবিধ প্রকারের পরবশতা—তদ্রূপই শোচনীয় এবং অমঙ্গল-জনক। পরপুষ্ট ইতর-জীব অপর জীবের দেহ হইতে রস রক্ত গ্রহণ করিয়া, তাহাকে অবসাদ-গ্রস্ত করে, মানবের ক্ষেত্রে দেহ হইতে রসরক্ত গ্রহণ করা

---

(১৯) Lawyers, criminologists and philosophers frequently imagine that only want makes man work This is an erroneous view We are instinctively forced to be active in the same way as ants and bees—Loeb, Comparative Physiology of the Brain, p. 197.

(২০) The influence of slavery on the human race shows very plainly that man himself quickly loses his stamina when subjected to it.

—Wier, Dawn of Reason, p. 157.

নাই, কিন্তু যে আহার্য্য-বস্তু খাইতে পাইলে আমার দেহে রসরক্ত উৎপন্ন হইত সেই আহার্য্য বস্তু অথবা উহা সংগ্রহের উপায় সকল, অপর মানব গ্রহণ করিয়া অথবা নষ্ট করিয়া, আমাকে অবসাদ-গ্রস্ত করাই প্রচলিত নিয়ম হইয়াছে। পরপুষ্টজীব অন্য জীবকে যাদৃশ দুরবস্থায় আনয়ন করে, আমার আহার্য্য-লুণ্ঠনকারী আমাকে তাদৃশ দুরবস্থায় ফেলিয়া দেয়। প্রভু-মানব দেহ মনের কল্যাণকর নানাবিধ কর্ম্ম হইতে অপর মানবকে বঞ্চিত করিয়া, তাহার আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিয়া, তাহার আবশ্যকীয় অন্য বস্তু অথবা সেই বস্তুর প্রতিনিধি,—অর্থ—আত্মসাৎ করিয়া তাহার চেষ্টা সীমাবদ্ধ করিয়া, অপর মানবকে যে দুর্দ্দশায় উপনীত করে, তাহা পরপুষ্টাবস্থার সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়। যে পরবশ অবস্থায়, ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় কর্ম্ম ও চেষ্টা সীমাবদ্ধ কিম্বা প্রতিহত হয়, কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পরপুষ্ট-জীব স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করে, কিন্তু মানব অনন্যগতি হইয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ফল, উভয় ক্ষেত্রেই সমানসাংঘাতিক। এই নিমিত্তই মনু বলিয়াছেন,—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখং ॥

শ্রীশশধর রায়।

ক্ষমা।

কত অপরাধ করেছি গো পদে
সকলি করেছ ক্ষমা
এখনও আমি এত অপরাধী
নাহি যে তাহারি সীমা।
তাও ভগবন ক্ষমিতেছ দেখি
হ'তেছে বড়ই ভয়,
এবে এই শুধু মাগি তব কাছে
এমন না যেন হয়।

কারণ জানিগো, যদি ক্ষমা পাই,
বেড়ে যাবে মোর দোষ,
দোষী ক্ষমা পাবে শুধু তব কোলে—
এ কিরূপ পরিতোষ ?
করিও না ক্ষমা দিওগো বেদনা
যখনি করিব ভুল,
সদা এইটুকু মনে থাকে যেন,
তুমিই সবারি মূল।

শ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল।

অপৌরুষেয় বাণী।

[Revelation]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি ? মানব-জ্ঞানে ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাহারা বলিবেন, কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের পক্ষে উত্তর দুই দিক্ হইতে দেওয়া চলে। প্রথম,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে তো ঈশ্বর-বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র। সুতরাং, মানব যে পরিমাণে প্রকৃত জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, ধর্ম্মও মানুষকে পরিত্যাগ করিবে। অন্ততঃ, ঈশ্বর-বিশ্বাস দূরে পলায়ন করিবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস ছাড়া যদি

কোন ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা থাকিতে পারে। এই মতটি নিজেই একটা মস্ত কুসংস্কার। কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ নাস্তিকাবাদ থাকিলেও থাকিতে পারিত এবং কোন কোন স্থলে ছিলও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে তদন্ত নাস্তিক্যবাদ আর নাই। উহা কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এ মতের বিচার নিস্প্রয়োজন। দ্বিতীয়,—মানব-জ্ঞান, মানবের বিচারবুদ্ধি, ধর্ম্মের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। মানবের এমন কোন মনোবৃত্তি নাই যাহার সাহায্যে সে ব্রহ্ম-তত্ব অবগত হইতে সমর্থ। ব্রহ্ম-তত্ব তাহার নিকট উপর হইতে আসে। সে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। সে তত্ব তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত, তাহার বিচারবুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। সে যদি তাহা লইয়া বিচার করিতে বসে, তো অনর্থই ঘটাইবে। তাহা পাইলে নির্ব্বিচারে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর—ইহাই ধর্ম্ম-তত্ব সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা। অবশ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তত্ব উপর হইতেই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম মানুষের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন। ইহাই ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম-জীবনের মূল ভিত্তি। যাহাতে ব্রহ্ম-বাণীর স্থান নাই, তাহা ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। বাস্তবিক, ধর্ম্ম তত্ব মানবের নিকট ব্রহ্মের প্রকাশ। এ কথা স্বীকার করিতে কোন ধর্ম্মবিজ্ঞানবিদ কুণ্ঠিত হইবেন না যে, ব্রহ্মের প্রকাশ—বাণী (revelation) রূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ—ছাড়া ধর্ম্ম হয় না। ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ছাড়া মানবের ধর্ম্ম পিপাসা কখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। জীব-আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ, জীবাত্মার পরমাত্মার সাক্ষাৎ লীলাই ধর্ম্ম। শুধু বুদ্ধি-বিচারে মীমাংসায় ধর্ম্ম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে যে, মানবের জ্ঞান ও তাহার বুদ্ধি বিচারের সঙ্গে এই তত্বের যে সম্বন্ধ স্থানে স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে তাহা কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না। বুদ্ধি-জীবী মানুষের বুদ্ধি (reason) তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান পরিণতির সঙ্গে মিশ খাইবে না, এই মত কখনও স্বীকৃত হইতে পারে না। যে প্রকাশে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব ও মানুষের সর্ব্বপ্রধান গৌরব তাহা তাহার জ্ঞানের বিরোধী বা তাহার জ্ঞানের অতীত, ইহা অতীব অসঙ্গত মত। একটু তলাইয়া দেখিলেই ইহার ভ্রান্তি ধরা পড়িবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোন কোন মতে, ধর্ম্ম, বুদ্ধির কাছে, কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এ মতে অবশ্য, ধর্ম্ম বুদ্ধির গ্রাহ্য। ধর্ম্ম-তত্বের আলোচনায় জ্ঞানের অধিকার আছে। অন্যমত বলিবেন, ধর্ম্মতত্ব বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে। মানব-মন লৌকীক বিষয়েরই কেবল ধারণা করিতে পারে, আলোচনা করিতে পারে। পরমার্থ তত্ব লৌকীক জ্ঞানের অতীত। হয়, সে তত্ব মানবের জ্ঞান বিচারের সম্পূর্ণ অতীত, না হয়, তার সিদ্ধান্তের বিরোধী। অর্থাৎ, বিচারের কাছে যাহা অসম্ভব, তাহাই পরমার্থ-তত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই মত কিন্তু ধর্ম্মকে জ্ঞানের অনধিগম্য বলিতেছে না। যাহা বুদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহাই সত্য—পরমার্থ-তত্ব-নির্ণয় মানব-জ্ঞানের এই প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং, সে তত্ব বিচারের বাহিরে পড়িতেছে না। যদিও ধর্ম্মতত্ব নির্ণয় নিতান্ত একটা বুজরুকীর ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। জ্ঞান ও ধর্ম্ম যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে কোনটা গ্রহণীয় তার বিচার ভার উভয়ের অতীত কিছুর উপর পড়িবে। সে কিছু কি? জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই তো নাই। পরমার্থিক-সত্য, অপৌরুষের বাণী যে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা কাহার সিদ্ধান্ত? জ্ঞানের সিদ্ধান্ত নয় কি? জ্ঞানের দ্বারা

সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম যে বাণী গ্রহণ করিতে হইবে, অথচ জ্ঞানকে বলা হইতেছে যে, যাহা তোমার মীমাংসার বিরোধী তাহাই গ্রহণ কর। ইহা যদি বুজ্‌রুকি না হয় তবে বুজ্‌রুকি কি তাহা জানি না। সুতরাং জ্ঞান (reason) ও বাণী (revelation) একান্ত বিরোধী হইল। অর্থাৎ বিশ্বাস যাহা গ্রহণ করিবে, জ্ঞান তাহা বর্জ্জন করিবে। তাহা হইলে, ফল হইবে যে ভিতর অবিশ্বাস। না হয়, গায়ের জোরে সন্দেহ চেপে রাখা। মানব প্রকৃতিতে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, এই চাপ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। তাই সর্ব্বদেশে বিশেষভাবে খৃষ্টীয় জগতে ইহার পরিণাম হইয়াছে, জ্ঞানালোচনাকারীদের পক্ষে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা। হয় জ্ঞানের সঙ্গে বাণীর বা আপ্তবাক্যের সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে; না হয়, জ্ঞান আপ্তবাক্য সম্বন্ধে হাঁ না কোন কথাই বলিবে না। অর্থাৎ, আপ্তবাক্য জ্ঞান বিরোধী নয় কিন্তু জ্ঞানের অতীত। আমাদের কাছে তাহা অবোধ্য হইতে পারে, অবোধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করা চলিবে না যদি প্রমাণ করা যায় যে, ইহা আপ্তবাক্য বা অপৌরুষেয় বাণী। তাহা হইলে এখন প্রশ্ন হইতেছে কি উপায়ে জ্ঞানের সাক্ষ্য অতিক্রম করিয়া, আপ্তবাক্যের আপ্ত-বাক্যত্ব প্রমাণ করা যায়।

আপ্তবাক্য কি? ভগবান্ লোক-শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, বা সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগকে—যেমন আমাদের দেশে বিশ্বাস, ঋষিদিগকে—অনুপ্রাণনা দিয়াছেন এবং অনুপ্রাণিত অবস্থায় তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন বা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আপ্ত-বাক্য। এখন দেখা যাক, আমরা এখানে আমাদের জ্ঞানকে কতটা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছি। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—এখানে দেখা যাইতেছে, আপ্ত-বাক্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমাকে অনেকগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব আবার মানিয়া লইতে হইবে, যে গুলি আপ্তবাক্য হইতে পারে না। অর্থাৎ, ভগবান্ আছেন, তিনি অবতীর্ণ হন, তিনি উপদেশ দেন। এ উপদেশ গুলি আবার সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন হওয়া চাই, নতুবা ইহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং লৌকিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের পার্থক্য বিচার, আমাকেই করিতে হইবে। কাজেই, ধর্ম্মতত্ত্ব আমার জ্ঞানের অতীত, একথার কোন সার্থকতাই থাকিতেছে না। কতকগুলি তত্ত্ব আমার আয়ত্ত আর কতক নয়—এ কথা বলিলেও ঐ বিপদ। কোন্ গুলি আয়ত্ত, আর কোন্ গুলি নয়, তাও আমার বিচারাধীন। তারপর, এই উপদেশ গুলি যে আপ্তবাক্য, আপ্ত বাক্যের জ্ঞান আমার আগে হইতে না থাকিলে, তাহা বুঝিব কিরূপে? যার কাঞ্চনের জ্ঞান নাই, কাঞ্চন তার কাছে উপস্থিত করিয়া কি লাভ? সুতরাং, যাহা বাহির হইতে আনিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা যে আগে হইতে অন্তরেই রহিয়াছে। না থাকিলে, আপ্তবাক্য ও লৌকিক কথার কোন পার্থক্য আমার কাছে থাকিবে না। সুতরাং দাঁড়াইয়াছেন,

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

—নারদপঞ্চরাত্র।

যদি বলা যায়, আপ্ত বাক্যের মধ্যে এমন কিছু আছে যে তা দেখ্‌লে বুঝা যাবে উহা আপ্ত-বাক্য, ভিতরের কিছুর প্রয়োজন হইবে না, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এই দাবী নিতান্ত ভিত্তিহীন। শাস্ত্রাদি তো দূরের কথা; অবতারদিগের মুখ হইতে যাঁহারা উপদেশ শুনিয়াছিলেন,

তাহাদের অধিকাংশই সেগুলি আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যদি বলা যায়, বুঝিতে সময় লাগিবে, আত্মাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা হইলেও তো ভিতরের কিছুর প্রয়োজন হইতেছে। লৌকিক কথায় বলে—ঘুরে শোও ফিরে শোও, পৈথানেতে পা, ঘুরে ফিরে জ্ঞানেরই দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। যে জ্ঞানকে বাদ দিয়া ধর্ম্মের সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব, নেড়ে চেড়ে দেখা যায় সেই জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় কথা, তিনি যে অবতার তার প্রমাণ কি? শিষ্যেরাই তো অবতার গড়িয়াছে। তাহারা যে ভুল বুঝে নাই, তার মীমাংসা কে করে? প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা বা প্রত্যক্ষ-শ্রোতাদের মধ্যেই তো অনেক সময় মতভেদ উপস্থিত হয়। সুতরাং অবতার যে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, খাঁটি খবর আমি পাব কোথায়? খালি ভগবানকে অবতীর্ণ হয়ে উপদেশ দিলে হবে না। টীকাকারকেও অবতারই হতে হবে। তাতেও নিস্তার নাই, আমি যদি বুঝতে ভুল করি। সুতরাং আমাকেও অবতার—নিদেন পক্ষে, অনুপ্রাণিত—হতে হবে। তাই যদি হয়, তবে ভগবান্ তো আমার অন্তর্যামীরূপে রয়েছিলেনই—তবে তাঁকে ৬ হাজার পাঁচ হাজার বৎসর জুড়িয়া বৃন্দাবন হতে শাস্ত্রের রশি দিয়া টেনে আন্‌তে হবে কেন? যতই তলাইয়া দেখা যায়, দেখা যাইবে ধর্ম্মতত্ত্বের আদি অন্ত মধ্যে জ্ঞানের জালই জড়িত রহিয়াছে। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। আর যদি অবতার বলিয়াই থাকেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ তাহলেই কি সেটা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে? যে কেউ ভগবানত্বের দাবী করিলেই যদি তাহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে এ বিশ্বে ভগবানের ঠাঁই হইবে না। সংসারে বাতুলের সংখ্যা কম নয়। মৃগী হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি আপদে পড়িয়া মানুষ অনেক সময় অনেক অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং এখানেও বাছিয়া লইতে হইবে এবং সাচ্চা ঝুটা বাছিয়া লইবার ভার, আমরাই। অন্যদিকে, অনুপ্রাণিত হইয়া উপদেশ দিবার বা লিপিবদ্ধ করিবারও বিপদ কম নয়। কোন্ টুকু অনুপ্রাণন, কোন্ টুকু মানুষ নিজের নিম্নভূমির কথা যোগ করিতেছে, তাহা বুঝিব কিরূপে? যাঁহারা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা মধ্যবর্ত্তীকে অজ্ঞান করিয়াও নিস্তার পান না। প্রেত-মধ্যবর্ত্তীর মধ্যদিয়া কিছু প্রেরণ করিল, মধ্যবর্ত্তীর সুপ্ত-আত্মার (subliminal self) তাহার মধ্যে কিছু যোগ করিয়া দিল—সে অজ্ঞাতসারেই করিল, ইচ্ছা করিয়া করিল না। সুতরাং আমরা প্রেতলোকের খাটি খবর পাইলাম না। এখানেও তুষ হইতে শস্য বাছিয়া লইবার ভার, জ্ঞানের, নান্যঃপন্থা। বাস্তবিক, যখন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া বলি,—আহা! কি স্বর্গীয়!—মনে রাখিতে হইবে, স্বর্গটা ভিতরে, বাহিরে নয়। কেহ হয়তো বলিতে পারেন, অবতার বা অনুপ্রাণিতব্যক্তি যখন অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা আপনার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন তাঁহার উপদেশ বিচার বিতর্কের অতীত, সুতরাং অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এখানেও ধরিয়া লওয়া হইতেছে, লৌকিক অলৌকিক সকল জ্ঞানই আমার মধ্যে আছে এবং কোন্‌টা লৌকিক কোন্‌টা অলৌকিক তাহার বিচারকর্ত্তাও, আমি। জ্ঞানের সীমানা সঙ্কুচিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেকটা বেশী বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যখন কোন ঘটনাকে বলিব, ইহা নৈসর্গিক নয়, তখন সকল নৈসর্গিক জ্ঞানতো আমার মধ্যে থাকা চাই-ই এবং ঐ জ্ঞান-ভাণ্ডার অতিক্রম না করিলে, কোন কিছুকে নৈসর্গিক নয় বলিবারও অধিকার থাকিবে না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও, আমাকে তাঁহার